অলকনন্দা

নারায়ণ সান্যাল

তিন সঙ্গী ॥ ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট ॥ কলকাতা—৭৩

তিন সঙ্গী প্রকাশ	:	জুলাই, ১৯৬৫
প্রকাশিকা	:	রেবা গঙ্গোপাধ্যায় তিন সঙ্গী ৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা— ৭৩
মুদ্রক	:	শীতলচন্দ্র রায় তারকেশ্বর প্রেস ৬, শিবু বিশ্বাস লেন, কলকাতা—৬
প্রচ্ছদ	:	প্রবীর সেন

॥ এক ॥

"আই চুজ্ মাই ওয়াইফ, অ্যাজ শী ডিড হার ওয়েডিং গাউন, ফর কোয়ালিটিস্ দ্যাট উড উয়্যার ওয়েল।"—কথাটা গোল্ডস্মিথের। মানে স্ত্রী যে মন নিয়ে বিবাহের বেনারসীটি কিনেছিলেন, আমিও ঠিক সেই মন নিয়েই আমার জীবন-সঙ্গিনীকে বেছে নিয়েছি---উভয়েরই লক্ষ্য ছিল সেই গুণটি, অর্থাৎ—। দূর ছাই! সব ইংরেজি কথারই কি বাঙলা করা যায়? অন্তত আমি তো পারি না। বাঙলা ভাষাটার উপর আমার তেমন দখল নেই। মনে হয়, সব কথা বাঙলায় বোঝানো যায় না। মনের ভাবটা কাগজের বুকে কালির আঁচড়ে টানতে গেলেই মৌসুমী ভিজে বাতাসে তা স্যাঁৎসেতে হয়ে যায়। অথচ ঐ কথাই ইংরেজিতে বল, কোথাও বাধবে না।—গ্যালপে গ্যালপে এগিয়ে যাবে কলম। হয়তো ছেলেবেলা থেকে সাহেবদের স্কুলে পড়ে আমার এই হাল। সুনন্দা বেশ বাঙলা বলে, সুন্দর চিঠি লেখে। বাঙলা-অনার্সের ছাত্রী ছিল সে। যদিও শেষ পর্যন্ত অনার্স নিয়ে পাশ করতে পারেনি, তবু ভাষাটা শিখেছে।

সে যা' হোক—যে কথা বলছিলুম। সুনন্দাকে আধুনিক পদ্ধতিতেই বিবাহ করেছি। প্রথমে পরিচয়, পরে প্রেম ও পরিণামে পরিণয়। তবু মনে হয় নির্বাচনের সময় আমি তার বাহ্যিক দিকটার দিকেই বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলুম। বিলাতফেরত বড়লোকের একমাত্র পুত্রের, কোম্পানির একচ্ছত্র মালিকের স্ত্রীর যে গুণগুলি নিতান্ত প্রয়োজনীয় সুনন্দার তার কোনটারই অভাব ছিল না। তাই তাকে নির্বাচন করেছিলুম। ঠকিনি। বন্ধুবান্ধবেরা এখনও ঠাট্টা করে বলে—'লাকি ডগ্'! চ্যাটার্জি সেদিন মশ্করা করে বল্লে—'তোমার নামের পিছনে বিলাতী এ্যাল্ফাবেটের সঙ্গে আরও দুটো অক্ষর এখন থেকে বসাতে পার—এইচ্. পি।'

আমি বললুম—এইচ্. পি-টা কি বস্তু ?

বলে—মিস্টার হেন্ পেক্‌ড !

জবাব দিই নি। চ্যাটার্জি ও কথা বলতে পারে। ও হতভাগা সিউডো-ব্যাচিলর। স্ত্রী ওর সঙ্গে থাকে না। বেচারা।

সত্যিই পছন্দসই লক্ষ্মী বউ একটা···একটা এ্যাসেট। আর উড়োনচণ্ডী দ্বিচারিণী হচ্ছে যাকে বলে, 'ব্যাঙ্ক-ক্র্যাশ' ! ঠিকই বলেছেন স্ভেন্—"ম্যারেজ উইথ এ গুড উয়োম্যান ইজ এ হারবার ইন দি টেমপেস্ট অফ লাইফ; উইথ এ ব্যাড উয়োম্যান, ইট ইজ এ টেমপেস্ট ইন দি হারবার।" অর্থাৎ—

অর্থাৎ থাক। মোটকথা সুনন্দা আমাকে কানায় কানায় ভরে রেখেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কারখানার কাজে ডুবে থাকি, সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারখানার কাজের চিন্তা আমার মনের সবটুকু দখল করে রাখে। সুনন্দার মত সতী-সাধ্বী স্ত্রী না হ'লে আমার জীবনটা মরুভূমি হয়ে যেত। কী নিরলস পরিশ্রমে সে আমার কাছে কাছে থাকে। আমার প্রতিটি মুহূর্তকে মধুর করে তোলে। সময়ে চায়ের পেয়ালাটি, কফির কাপ, হাতে গড়া কেক পুডিং যোগান দিয়ে যায়। সপ্তাহান্তে দু'জনে সিনেমা যাই। রাত্রে নিচে ডানলোপিলো আর পাশে সুনন্দার নরম আশ্রয়ে ওর আবোল-তাবোল বকুনি শুনতে শুনতে কখন ঘুমিয়ে পড়ি। স্ত্রীর কর্তব্যে সুনন্দা যেমন ক্রটিহীন আমিও স্বামীর কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন। আমাদের দাম্পত্য-জীবন ছককাটা ঘরে নিয়মের তালে তালে পা ফেলে চলে। এতটুকু বিচ্যুতি সহ্য করি না আমরা। অফিস থেকে বাড়ি ফিরতে আমার সাতটা বাজে। এই সাতটা পর্যন্ত সুনন্দার ছুটি। ইচ্ছামতো সে বেড়াতে যায়, বই পড়ে, অথবা—অথবা কি করে তা অবশ্য আমি জানি না। অর্থাৎ জানবার চেষ্টা করিনি। কেন করব ? সেটা স্বামী হিসাবে আমার অনধিকার চর্চা হয়ে যেত। সন্ধ্যা সাতটার পূর্বমুহূর্তটি পর্যন্ত সময়টা তার পকেটমানির সামিল। সে যেমন খুশী তা

খরচ করতে পারে। কিন্তু ঠিক সাতটার সময় আমি যখন বাড়ি ফিরি তখন সে আমাকে রিসিভ করবার জন্য একেবারে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করে। প্রসাধন সেরে মাথায় একটি লাল গোলাপ গুঁজে একেবারে রেডি!

মাথায় লাল গোলাপ দেবার কথায় একটা পুরনো কথা মনে পড়ল। আমিই তাকে একদিন বলেছিলুম—প্রসাধনের পর খোঁপায় একটা লাল গোলাপ ফুল দিলে তাকে আরও সুন্দর দেখায়। তারপর থেকে প্রতিদিন সে এ কাজটি নিয়মিত করে। একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে দেখলুম ওর খোঁপায় ফুল নেই। সেদিন অফিসের কি একটা গণ্ডগোলে এমনিতেই আমার মেজাজ খাপ্পা হয়ে ছিল। রাগারাগিটা বোধহয় বেশী করে ফেলেছিলুম। ওর এক বান্ধবী, নমিতাদেবী বেড়াতে এসেছিলেন। তাঁর সামনে ধমক দেওয়ায় সুনন্দা বড় অপমানিত বোধ করেছিল। রাত্রে নন্দা বললে—তুমি নমিতার সামনে কেন অমন করে বকলে আমায়?

আমি বলি—তোমাকে আমার বলা আছে—সন্ধ্যাবেলায় মাথায় একটা গোলাপ ফুল দেবে। তোমার খোঁপায় ফুল না থাকলে আমার ভাল লাগে না। তুমি ফুল দিতে ভুলে গেলে কেন আজ?

নন্দা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—কি করব? আমাদের বাগানে আজ কোন গোলাপ ফোটেনি যে।

ভাবলুম বলি—এ বাড়িতে একটি গোলাপ নিত্য ফুটে আছে দেখে গাছের গোলাপগুলো আর ফুটতে সাহস পায় না। কিন্তু না, তাতে ওকে আশ্‌কারা দেওয়া হবে। কর্তব্যে অবহেলা করলে কঠোর হতে হয়। তা সে অফিসের লোকই হোক অথবা বাড়ির লোকই হোক। কড়া সুরে বলি—লিঙ্কন বলেছেন—'নেভার এক্সপ্লেন। য়োর এনিমিজ ডু নট বিলিভ ইট অ্যাণ্ড য়োর ফ্রেণ্ডস্ ডু নট নীড ইট', অর্থাৎ—কদাচ কৈফিয়ত দিও না, কারণ তোমার শত্রুরা তাহা বিশ্বাস করে না এবং তোমার বন্ধুদের তাহাতে প্রয়োজন নাই—

বাধা দিয়ে নন্দা বলে—থাক, অনুবাদ না করলেও বুঝতে পেরেছি। তোমাকে আর কষ্ট করতে হবে না। কিন্তু বাগানে ফুল না ফুটলে কি করে মাথায় ফুল দেওয়া যায়—সে সম্বন্ধে চশার থেকে ইলিয়টের মধ্যে কেউ কখনও কিছু বলেছেন কি?

আমি কোন জবাব দিইনি। দিতে পারতুম, দিইনি। জবাবে আমি ওকে মনে করিয়ে দিতে পারতুম—বায়রনের সেই অনবদ্য উক্তিটি—'রেডি মানি ইজ আলাদীনস্ ল্যাম্প' (নগদ টাকা আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপ)। মুখে বলিনি, কারণ সেটা ব্যবহারে পরে বুঝিয়ে দেব বলে।

এরপর প্রত্যহ নিউমার্কেট থেকে আমার বাড়ি ফুল সরবরাহের ব্যবস্থা করে দিলুম।

একটা বিলাতী অর্কেস্ট্রা যেমন ঐক্যতানে বাজে—এ সংসারের সবকিছুই তেমনি একটা শৃঙ্খলা বজায় রেখে আমাদের দাম্পত্যজীবনের মূল সুরটি ধরে রেখেছে। একচুল বিচ্যুতি ঘটবার উপায় নেই। যত কাজই থাক, আমাদের দাম্পত্যজীবনের সুখ সুবিধার ক্ষতি হতে পারে এমন কিছু ঘটতে দিতুম না। রবিবার সন্ধ্যায় আমার ডায়েরিতে কোন অন্য এ্যাপয়েন্টমেন্ট ঢুকতে পারেনি। সপ্তাহান্তিক অবসরটা আমি স্ত্রীর সঙ্গে কাটাই। শহরে কোন একটি প্রেক্ষাগৃহের সবচেয়ে সামনের অথবা সবচেয়ে পিছনের দুটি আরামদায়ক আসন আমাদের প্রতীক্ষায় প্রহর গোণে। আমার আর্দালী রামলালকে পাঠিয়ে টিকিট কিনে রাখার দায়িত্ব নন্দার। কি বই দেখবে তার নির্বাচনের ভার সম্পূর্ণ সুনন্দার উপর ছেড়ে দিয়েছি। প্রথম প্রথম নন্দা এ বিষয়ে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতে চাইত। কোন্ কাগজে কি সমালোচনা বের হয়েছে, কে কি বলেছে আমাকে শোনাতে আসত। আমি সিধে কথার মানুষ। ডিভিসন অফ লেবারে বিশ্বাসী। এ বিষয়ে যখন তাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া আছে তখন আমি অহেতুক নাক গলাই কেন? সে যেখানে আমায় নিয়ে যাবে আমি সেইখানেই যেতে

রাজী। ইবসেনের নোরার মত সে যেন না কোনদিন বলে বসতে পারে —তাকে নিয়ে আমি পুতুল খেলা করেছি মাত্র। প্রেক্ষাগৃহের সবগুলি আসনের সামনে বসলে বুঝি থিয়েটার দেখছি—সবার পিছনে যখন বসি তখন বুঝে নিই—এ রবিবারে নন্দা আমাকে সিনেমা দেখাচ্ছে।

শুধু এই একটি বিষয়েই নয়—অনেক গুরুতর বিষয়েও আমি তাকে মতামত প্রকাশ করবার সুযোগ দিই। তার নির্দেশের উপর অন্ধ নির্ভর করি। এই তো সেদিন কোম্পানি আমার জন্য একজন অতিরিক্ত লেডি স্টেনো স্যাংশন করল আপনারাই বলুন, এ বিষয়ে কেউ কখনও স্ত্রীর পরামর্শ নিতে যায়? নিজেই ইণ্টারভ্যু নেয়, নিজেই নির্বাচন করে—এমন কি ক্ষেত্রবিশেষে সংবাদটা ধর্মপত্নীর কাছে বেমালুম চেপে যায়। আমি এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রম। এবং এসব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটাই আমার কাছে নিয়ম! আমি সবকটি দরখাস্ত সুনন্দাকে এনে দিলুম। অকপটে বললুম—তুমি যাকে নির্বাচন করে দেবে, আমি নির্বিচারে তাকেই গ্রহণ করব।

পাঠক! তুমি পার এতটা উদাসীন হতে?

আমি পারি। নন্দার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। তার অন্যায় আবদার পর্যন্ত আমি মুখ বুজে সহ্য করেছি। জানি না, দরখাস্তকারিণীরা এ নিয়ে আমার বিষয়ে কী ভেবেছিল! কেউ কি স্বপ্নেও ভাবতে পারে যে. শুধুমাত্র স্ত্রীর অনুরোধেই অলক মুখার্জি সকলের ফটো চেয়ে পাঠিয়েছিল? পাঠিকা! তুমি যদি দরখাস্তকারিণী হতে তাহ'লে কি বিশ্বাস করতে পারতে যে, তোমার ফটোখানি না দেখেই আর পাঁচখানা ফটোর সঙ্গে তুলে দিয়েছিলুম আমার ধর্মপত্নীর হাতে? অন্য কেউ না জানুক আমি নিজে তো জানি। আর নন্দাও জানে যে, তার একটা খেয়াল চরিতার্থ করতেই আমাকে এই আপাত অশোভন কাজটি করতে হয়েছিল।

ফটোর বাণ্ডিলটা তার হাতে দিয়ে ঠাট্টা করেছিলুম—এই

নাও। এর থেকে বেছে বেছে সবচেয়ে কুৎসিত মেয়েটিকে খুঁজে বার কর এবার।

সুনন্দা সাগ্রহে ফটোর বাণ্ডিলটা আমার হাত থেকে নেয়। ভানলোপিলো গদির উপর উবুড় হয়ে পড়ে বাছতে থাকে ছবির গোছা। হঠাৎ একখানি ফটোতে তার দৃষ্টি আটকে গেল। ফটোখানি আমার দিকে বাড়িয়ে ধরে বলে—কেমন দেখতে মেয়েটিকে ?

আমি বললুম—কি বললে তুমি খুশী হও ?

—সত্যি কথা বললে। মেয়েটি কি খুব সুন্দরী ?

—না।

—মেয়েটি কি কুৎসিত ?

—না।

—তাও না ? তবে কি মেয়েটি মোটামুটি সুন্দরী ?

—তা বলা চলে।

হঠাৎ ধমক দিয়ে ওঠে সুনন্দা—কোন্‌খানটা ওর সুন্দর দেখলে তা জানতে পারি কি ?

কী বিপদ ! কি বললে সুনন্দার সঙ্গে মতে মিলবে তা বুঝে উঠতে পারি না। ছবি দেখে মেয়েটিকে সত্যিই কিছু আহা-মরি সুন্দরী বলে মনে হচ্ছে না। ছিপ্‌ছিপে একহারা চেহারা। রূপসী না হলেও মুখখানি উজ্জ্বল, বুদ্ধিদীপ্ত। সুনন্দা আবার বলে—কই বললে না ? ওর কোনখানটা সুন্দর লাগল তোমার ?

বললুম—'দি বেস্ট পার্ট অব বিউটি ইজ দ্যাট, হুইচ নো পিকচার ক্যান এক্সপ্রেস' (সৌন্দর্যের মর্মকথা সেটাই, যেটা ছবিতে ধরা দেয় না)—

—রাস্‌কিন বলেছেন বুঝি ?

—না। বেকন।

—তা আমি তো আর বেকন সাহেবের মতামত শুনতে চাইনি। আমি শুনতে চাই তোমার কথা।

বললুম—আমার মতামতটা না জিজ্ঞাসা করাই ভালো। সৌন্দর্যের তো কোনও মাপকাঠি নেই—সুতরাং কতটা সুন্দর তা বোঝাতে গেলে তুলনামূলক শব্দ ব্যবহার করতে হয়। অন্য ছবিগুলো তো আমি দেখিনি। তা কার সঙ্গে তুলনা করব বল ?

—অন্য ছবিগুলো তুমি দেখনি ? শুধু এই একখানি ছবি দেখেই এত মোহিত হয়ে গেলে ? কিন্তু কেন ? কি দেখলে তুমি !

আমি বলি—কী আশ্চর্য ! তুমি আমার কথাটা বুঝতেই চাইছ না। মোহিত হয়ে যাবার কোন কথাই উঠছে না। এখানাও তো আমি আগে দেখিনি। তুমি এখন দেখালে, তাই। এখন কথা হচ্ছে তুলনা করতে হলে—

বাধা দিয়ে নন্দা বলে—বেশ দেখ, সবগুলো ছবিই দেখ।

ছবির বাণ্ডিলটা সে ছুঁড়ে দেয় আমার দিকে। অজানা অচেনা একগুচ্ছ মেয়ে লুটিয়ে পড়ল আমার পায়ের কাছে। আমি তাসের প্যাকেটের মতো সেগুলি তুলে রেখে দিলুম টিপয়ে। দেখলাম না চোখ তুলেও। বললুম—না। আমি দেখব না। তুমি যাকে পছন্দ করে দেবে তাকেই বহাল করব আমি।

—কিন্তু না দেখলে তুলনামূলক বিচার তো তুমি করতে পারবে না!

—না হয় নাই পারলুম।

—তাহলে বরং আমার সঙ্গে তুলনা করে বল। না কি আমার দিকেও কখন চোখ তুলে দেখনি তুমি ?

বললুম—মাপ কর নন্দা, সে আমি পারব না। তোমার সঙ্গে কোনও মেয়ের তুলনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার পাশাপাশি কোন মেয়েকে বসিয়ে মনে মনে তুলনা করছি—এটা আমি ভাবতেই পারি না। করলেও বিচারটা ঠিক হবে না। সে ক্ষেত্রে হয়তো মিস্ য়ুনিভার্সও আমার কাছে পাশ-মার্ক পাবেন না।

সুনন্দা লজ্জা পায়। বলে—যাও, যাও। অতটা ভালো নয়।

সুনন্দা জানে, আমি মিথ্যা কথা বলিনি। সে মর্মে মর্মে জানে যে,

তার রূপের জ্যোতিতে আমি অন্ধ হয়েই আছি। গাল দুটি লাল হয়ে ওঠে, দৃষ্টি হয় নত। রূপের প্রশংসা করলেই নন্দার ভাবান্তর হয়। অথচ তার রূপের প্রশংসা আমাকে প্রায় প্রত্যহই করতে হয়।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এ জন্যে আমাকে মিথ্যাভাষণ করতে হয় না। বস্তুত সুনন্দা নিজেই জানে যে, সে অপূর্ব সুন্দরী। আমি না বললেও পথচারীরা বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টির লেফাফায় এ বারতা তাকে নিত্য জানায়। আমি অবশ্য তার সৌন্দর্যের প্রশংসা করি অন্য কারণে। আমি তার রূপের প্রসঙ্গ তুললেই সে লজ্জা পায়—লাল হয়ে ওঠে। যে কারণে বাড়িতে নিত্য ফুলের ব্যবস্থা করেছি ঠিক সেই কারণেই আমি মাঝে মাঝে ওর রূপের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করি। তখনই মনে পড়ে কবি গ্রেগরীর সেই কথা—'হোয়েন এ গার্ল সিজেস টু ব্লাশ, শী হ্যাজ লস্ট দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল চার্ম অব হার বিউটি।' অর্থাৎ, কোনও একটি মেয়ে তার সৌন্দর্যের প্রধান চার্মটি, মানে আকর্ষণটি তখনই হারিয়ে ফেলে যখন থেকে সে— কী আশ্চর্য, 'ব্লাশের' বাঙলা কি? লজ্জায় লাল হয়ে ওঠা? নাঃ! বাঙলায় ডায়েরি লেখা এরপর বন্ধ করে দেব। একটা ভালো কথা যদি বাঙলায় লেখা যায়!

মোটকথা, সুনন্দা আমাকে জোর করে ধরে বসল, ঐ মেয়েটিকেই চাকরিটা দিতে হবে। কেন, তা বলল না। মেয়েটির দরখাস্তখানি বার করলুম। পর্ণা রায়, বি.এ। ইতিপূর্বে কোথাও চাকরি করেনি। সম্প্রতি কমার্সিয়াল কলেজ থেকে স্টেনোগ্রাফি পাশ করেছে, স্পীডের উল্লেখ করেনি। অপরপক্ষে অন্যান্য প্রার্থিনীদের সুপারিশ ছিল, প্রাক্তন অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর ছিল অভিজ্ঞানপত্রে (টেস্টিমোনিয়ালের বাঙলা ঠিক হল তো?)। সে কথা নন্দাকে বললুম। কিন্তু সে নাছোড়বান্দা। এ রকম বিপাকে পড়লে আপনারা যা করতেন আমিও তাই করলুম— কথা দিই—মোটামুটি যদি ডিক্টেশন নিতে পারে, তাবে তাকেই রাখব। আমি আমার কথা রেখেছি। না, ভুল হল, আমি যা কথা দিয়েছিলুম তার বেশীই করেছি। মেয়েটি মোটামুটি ডিক্টেশনও নিতে পারেনি।

তবু তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি। কেন? কারণ, আমি বুঝতে পেরেছি ভিতরে কোনও ব্যাপার আছে। সুনন্দা কি মেয়েটিকে চেনে? তাহলে স্বীকার করল না কেন? আমি যতই তাকে পীড়াপীড়ি করি সে অন্য কথা বলে এড়িয়ে যায়। একবার বলল—অন্যান্য দরখাস্তকারিণী-দের তুলনায় এ মেয়েটির রূপের সম্ভার অল্প। কথাটা, জানি, ডাহা মিথ্যে! না না, অন্যান্য ফটোর সঙ্গে তুলনা করে এ কথা বলছি না। বস্তুত অন্যান্য ছবিগুলি আমি আজও দেখিনি। (পাঠক! তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না, না? না হতে পারে, তুমি তো আমার সুনন্দাকেও দেখনি।) সম্ভবত সুনন্দা নিজেও দেখেনি। কারণ আমি জানি, সে ভয় নন্দার কোনদিন ছিল না, থাকতে পারে না। সে জানে, অলক মুখার্জি আর যাই করুক স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। আর একবার ও বললে—বেকার মেয়েটি যে ভাবে দরখাস্তে করুণ ভাষায় আবেদন করেছে তাতেই সে বিচলিত হয়েছে। এটাও বাজে কথা। কারণ সকলের দরখাস্তের ভাষাই প্রায় একরকম। শেষে বলে—দেখ, অন্যান্য মেয়ের পূর্ব অভিজ্ঞতা আছে, তারা সহজেই অন্যত্র চাকরি জুটিয়ে নেবে। এ মেয়েটিকে যদি আমি উদারতা না দেখাই, এর পক্ষে চাকরি যোগাড় করা শক্ত। এ কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারিনি। কিন্তু আমার বিশ্বাস এটাও আসল কথা নয়। আসল কথা, মেয়েটি সুনন্দার পূর্ব পরিচিত। তাহলে সে কথা ও স্বীকার করল না কেন?

কারণটাও অনুমান করতে পারি। সুনন্দা জানে আমি আদর্শবাদী। স্ত্রীর পরিচিত কাউকে চাকরি দেওয়ার অর্থ 'নেপটিজ্‌ম্' অর্থাৎ আত্মীয়-পোষণ। পর্ণা অবশ্য আমার আত্মীয় নয়, কিন্তু নেপটিজমের বাঙলা কি ঠিক আত্মীয়-পোষণ? 'পরিচিত-পোষণ' বলব কি? দূর হোক, বাঙলা না হয় নাই করলুম। জিনিসটা তো খারাপ? সুনন্দা জানে, অলক মুখার্জি কখনও নেপটিজমের কবলে পড়বে না—স্ত্রীর অনুরোধেও নয়। সম্ভবত সেই জন্যেই সে আসল কারণটা গোপন করে গেল।

এ প্রায় দেড়মাস আগেকার ঘটনা। ছয় সপ্তাহ আগে কোম্পানির

খাতায় একটি নতুন নাম উঠেছে। পর্ণা রায়, বি. এ। লম্বা একহারা বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। শ্যামলা রঙ। সমস্ত অবয়বের মধ্যে আশ্চর্য আকর্ষণ ওর চোখ দুটিতে। যেন কোন অতলস্পর্শ গভীরতার স্বপ্নে বিভোর। দিনান্তের শেষ শ্যামল-ছায়া যেমন দিগন্তের চক্রবালে আপনাতেই আপনি লীন হয়ে থাকে—মেয়েটির অন্তরের সব কথাই যেন তেমনি দুটি চোখের তারায় মগ্ন হয়ে আছে। ওর সে চোখের দিকে চাইলে মনে হয় সেখানে কোন নিগূঢ় স্বপ্ন নিঃসাড়ে সুপ্তিমগ্ন। তখন মনেও হয় না যে, ঐ ছায়া-ঘন শান্ত দিক্‌চক্রবালেই হঠাৎ ঘনিয়ে আসতে পারে কালবৈশাখীর ভ্রূকুটি। তখন সে চোখের দিকে তাকাতে ভয় হয়। আবার ঐ চোখেই ঘন কালো মেঘের ফাঁক দিয়ে হঠাৎ উঁকি দেয় অস্তসূর্যের শেষ স্বর্ণাভা! তখনও সে চোখের দিকে তাকানো যায় না—চোখ ঝল্‌সে যায়।

নন্দার চোখ দুটিও সুন্দর। অনিন্দ্য। সমস্ত মুখাবয়বের সঙ্গে অত্যন্ত মানানসই। কিন্তু সে চোখ জ্বলে না। সে যেন হরিণের চোখ—শান্ত, করুণ, উদাস—সরল সারঙ্গ দৃষ্টি। টেনিসনের ভাষায়—'হার আইজ আর হোমস্ অব সাইলেণ্ট প্রেয়ার'—সে চোখে যেন উপাসনা মন্দিরের স্নিগ্ধ সৌম্যতা। আর এই মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে মনে পড়ে শেক্সপীয়ারকে—'এ লাভার্স আইজ উইল গেজ অ্যান ঈগল্ ব্লাইণ্ড!' ঈগল পাখীও সে চোখের দিকে চাইলে অন্ধ হয়ে যায়।

এসব কথাই কিন্তু একেবারে প্রথম দিন মনে হয়নি। পরে হয়েছে। আমি যখন ডিকটেশন দিই ও মাথা নিচু করে কাগজের উপর দুর্বোধ্য আঁচড় টানতে থাকে। আমি ওর নতনেত্রের দিকে তাকিয়ে থাকি। সেখানেও যেন আমার অজানা ভাষায় কোন দুর্বোধ্য আঁচড় পড়ছে। আমি সে চোখের ভাষা পড়তে পারি না, ও পারে। আবার টাইপ-করা কাগজখানি সই করবার আগে আমি যখন পড়তে থাকি ও সামনে বসে থাকে চুপ করে। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তখন বুঝতে পারে যে, সে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। সে চাহনি ঈগল-দৃষ্টিকে

অন্ধ করে দেবার ক্ষমতা রাখে। আমি অসোয়াস্তি বোধ করি। পড়তে পড়তে যখনই চোখ তুলি—তৎক্ষণাৎ সে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়।

এসব কথাই কিন্তু প্রথম দিন মনে হয়নি। ক্রমে হয়েছে।

আমি ভুলেই গিয়েছিলুম যে, সুনন্দার আগ্রহাতিশয্যে এই মেয়েটিকে চাকরি দিয়েছি। সে কথা মনে পড়ল একদিন সুনন্দার কথাতেই। হঠাৎ ও একদিন বলে বসল—পর্ণা কেমন কাজ করছে?

—পর্ণা কে? আমি প্রতিপ্রশ্ন করি। আমার স্টেনোকে আমি মিস রয় বলেই ডাকি। তার নাম যে পর্ণা সে কথা সে সময়ে আমার খেয়াল ছিল না।

সুনন্দা ফোঁস করে ওঠে—অতটা ভালোমানুষী ভাল নয়; তোমার স্টেনোর নাম পর্ণা নয়?

—ও! মিস্ রয়? হ্যাঁ, তা ভালই কাজ করছে। কেন?

—না, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমারই অনুরোধে ওকে চাকরি দিলে তো। তাই জানতে চাইছি, আমার নির্বাচন তোমার পছন্দ হয়েছে কিনা।

এই পছন্দ অপছন্দ কথাগুলি বড় মারাত্মক। তাই ও প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলি—একদিন বাড়িতে নিয়ে আসব? আলাপ করবে?

সুনন্দা অস্বাভাবিকভাবে চমকে ওঠে। আর্ত কণ্ঠে বলে—না না না! অমন কাজ তুমি কর না।

আমি অবাক হয়ে যাই। বলি—ব্যাপার কি? এতটা ভয় পাওয়ার কি আছে? সে তো আর কামড়ে দেবে না তোমাকে?

সুনন্দা ততক্ষণে নিজেকে সামলে নিয়েছে। স্বভাবসিদ্ধ কৌতুকের ছলে বলে—কি করে জানলে?

—জানলুম, কারণ এতদিনেও আমাকে একবারও কামড়ায়নি।

—তাই নাকি! যাক্ নিশ্চিন্ত হওয়া গেল!

আমি বলি—নন্দা, তুমি আমাকে সেদিন মিছে কথা বলেছিলে, মেয়েটিকে তুমি চিনতে।

সুনন্দা এতদিনে স্বীকার করে।

—তাহলে সেদিন বলনি কেন ?

এতদিনে সব কথা খুলে বললে সে। বললে—পর্ণা আমাদের কলেজে পড়তো। একই ইয়ারে। খুব গরীব ঘরের মেয়ে। তাই ভেবেছিলাম—যদি বান্ধবীর একটা উপকার করতে পারি। তোমাকে বলিনি, পাছে আমার বান্ধবী বলেই তোমার আপত্তি হয়।

—তাহলে ওকে এখানে আনতে তোমার এত আপত্তি কিসের ?

—ও লজ্জা পাবে বলে। তোমার কাছে স্বীকার করতে সংকোচ নেই—ও ছিল আমার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। ক্লাসে কোনবার ও ফার্স্ট হয়েছে কোনবার আমি। দুজনেরই বাঙলায় অনার্স ছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রেও মেয়েটি আমার সঙ্গে টেক্কা দিতে চাইত। অবশ্য প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সে হেরে গেছে আমার কাছে। খেলাধূলা, ডিবেট ইত্যাদিতে আমার কাছে হার স্বীকার করেছিল। তাই আমাকে ভীষণ হিংসে করত। আজ যদি সে জানতে পারে—আমারই অনুগ্রহে ওর চাকরি হয়েছে—তখন ব্যথাই পাবে সে মনে মনে। ওদের বাড়ির যে অবস্থা তাতে চাকরি ও ছাড়তে পারবে না—অথচ প্রতিদিনের কাজ আত্মগ্লানিতে ভরে উঠবে ওর।

সুনন্দার উদারতায় মুগ্ধ হয়ে গেলুম। সে গোপনে উপকার করতে চায়। যার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিল—পাছে সে লজ্জা পায়, ব্যথা পায়, তাই সে কথা জানাতেও চায় না। ওর সব কথা শুনে স্নেহে শ্রদ্ধায় মনটা ভরে ওঠে। ওর মনের যেন একটা নূতন পরিচয় পেলুম। শুধু বহিরঙ্গই সুন্দর নয়, ওর অন্তরটাও সোনা দিয়ে মোড়া। ওকে কাছে টেনে নিয়ে বলি—খেলাধূলা, ডিবেট, পড়াশুনা সব ক্ষেত্রেই তো তাকে হারিয়ে দিয়েছিলে—কিন্তু কলেজ জীবনের আসল প্রতিযোগিতার কথাটা তো বললে না ?

—আসল প্রতিযোগিতা মানে ?

—মদন-মন্দিরের প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হয় নি তোমাদের ?

ও হেসে বলে—এ তো তোমাদের বিলেতের কলেজ নয়।

আমি বলি—তাহলে ফাইনাল-রাউণ্ডের খেলাটা হয়নি। কিন্তু সেমি-ফাইনালের খেলাতে ও তোমাকে হারিয়ে দিয়েছে নন্দা।

আমার বুক থেকে মুখ তুলে ও বলে—তার মানে?

—মিস্ রয় অনার্স নিয়েই বি. এ. পাশ করেছে।

সুনন্দা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকে। তারপর ধীরে ধীরে বলে—তুমি ওর অরিজিনাল সার্টিফিকেট দেখেছ?

—না, কেন?

—পর্ণা বি. এ. পরীক্ষা দেয়নি।

—কি বলছ যা তা, তাহলে দরখাস্তে ও কথা লিখতে সাহস পায়?

—আমি নিশ্চিতভাবে জানি। আমরা একই ইয়ারে পড়তাম। বিয়াল্লিশ সালে আমাদের পরীক্ষা দেবার কথা ছিল। পরীক্ষার আগেই ওকে পুলিসে ধরে। তারপর আটচল্লিশ সাল পর্যন্ত ও ছাড়া পায়নি। ইতিমধ্যে ওর বাবা মারা যান। আর পরীক্ষা দেওয়া হয়নি ওর।

আমি বলি—এও কি সম্ভব? পাশ না করেই মেয়েটি নামের পাশে বি. এ. লিখেছে?

সুনন্দা বলে, পর্ণার পক্ষে সবই সম্ভব।

—বেশ, খোঁজ নেব আমি।

—না থাক, দরকার কি? অত্যন্ত গরীব ঘরের মেয়ে পর্ণা। বাপও মারা গেছে। ওর সঙ্গে কলেজে একটি ছেলের খুবই মাখামাখি হয়েছিল। আমি ভেবেছিলাম, তার সঙ্গেই ওর বুঝি বিয়ে হয়েছে। দরখাস্ত পড়ে বুঝলাম তা হয়নি। কী দরকার এ নিয়ে খুঁচিয়ে ঘা করার! অহেতুক চাকরিটা খোয়াবে বেচারি। খাবে কি?

আমি বলি, কী যা তা বকছ নন্দা! এ তো জালিয়াতি রীতিমতো! জেল পর্যন্ত হতে পারে এ জন্য!

—বল কি, জেল পর্যন্ত হতে পারে? কিন্তু প্রমাণ করবে কি করে?

এ আলোচনা এখানেই বন্ধ করে দিই, বলি—এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো?

পরদিনই মিস্ রয়কে বলি—আপনার ক্রিডেনশিয়ালগুলোর এ্যাটেস্‌টেড কপিই দেখা আছে আমার। কালকে অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো সব একবার আনবেন তো।

লঙ্গদৃষ্টি দগ্ধী দৃষ্টি পড়ে আমার মুখের উপর।

—হঠাৎ, এতদিন পরে?

—হ্যাঁ। তাই নিয়ম। অরিজিনাল সার্টিফিকেটগুলো দেখে আপনার সার্ভিস বইতে সই করে দিতে হবে আমাকে। কাল সব নিয়ে আসবেন। ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানাও।

—ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানা তো কাল আনতে পারব না স্যার। সেটা দেশে আছে। অন্যান্য মূল কাগজ অবশ্য আনব।

কেমন যেন সন্দেহ বেড়ে যায়! সবই আছে কাছে, আর ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানাই দেশের বাড়িতে আছে। কিন্তু যখন ধরেছি তখন শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে আমাকে। বাধ্য হয়ে বলি—বেশ, উইকেণ্ডে আনিয়ে নেবেন। না হয় দুদিন ছুটিই নিন।

—দেশ মানে স্যার পাকিস্তান। সে তো আনা যাবে না স্যার।

একথার পর সন্দেহ আর বাড়ে না! এতক্ষণে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল। মেয়েটি বি. এ. পাশ করেনি আদপে। কিন্তু কী দুঃসাহস! সুনন্দার বান্ধবী বলে ক্ষমা করতে পারব না আমি। এ অপরাধ অমার্জনীয়। পুলিসে অবশ্য ধরিয়ে দেব না, কিন্তু চাকরিতেও রাখতে পারব না ওকে। আমার স্টেনো হিসাবে অনেক গোপন খবর ও অনিবার্যভাবে পাবে। যে মেয়ে এতবড় জালিয়াতি করতে পারে, তার পক্ষে সবই সম্ভব। কে জানে, অফিসের গোপন খবর জেনে নিয়ে হয়তো শেষে আমাকেই ব্ল্যাকমেইলিং করতে শুরু করবে। অগত্যা সুকৌশলে এগিয়ে যেতে হল আমাকে।

—আই সী! দেশ মানে পাকিস্তান! তা কোন ইয়ারে বি. এ. পাশ করেন আপনি?

—বেয়াল্লিশ সালে।

—কোন কলেজ থেকে?

—প্রাইভেটে।

—কোন কলেজে পড়তেন না আপনি?

—পড়তাম। পরে প্রাইভেটে পরীক্ষা দিই।

—অনার্স ছিল বলেছিলেন—না?

—হ্যাঁ, স্যার, বাঙলায়—সেকেণ্ড ক্লাস সেকেণ্ড হয়েছিলাম। ফার্স্ট ক্লাস সেবার কেউ পায়নি।

—ও। তা কোন কলেজে পড়তেন আপনি?

পর্ণা যে মফঃস্বল কলেজটির নাম করে সেখান থেকেই সুনন্দা বি. এ. পরীক্ষা দিয়েছিল। এবার তাই প্রশ্ন করি—আচ্ছা আপনাদের ঐ কলেজে সুনন্দা চ্যাটার্জি বলে একটি মেয়ে পড়তো?

ডিক্টেশনের পেনসিলটা দিয়ে কপালে মৃদু মৃদু টোকা দিয়ে পর্ণা একটু ভেবে নিয়ে বললে—সুনন্দা! কই মনে পড়ছে না তো? কেমন দেখতে বলুন তো?

—খুব সুন্দরী একটি মেয়ে?

—কই মনে তো পড়ছে না! সুমিত্রা না সুপ্রিয়া নামে একটা মেয়ে আমাদের ক্লাসে ছিল মনে হচ্ছে—বড়লোকের মেয়ে, একটু পুরুষালীভাব, খেলাধূলা সাইকেল চড়ায় মাতামাতি করত—কিন্তু সুন্দরী তাকে কেউ বলবে না। রঙটা অবশ্য ফর্সা ছিল মেয়েটির, কিন্তু মুখটা ছিল গোল-গাল, হুলো বেড়ালের মত!

আপাদমস্তক জ্বলে উঠে আমার। মেয়েটি শুধু জালিয়াতই নয়, চালিয়াতও। কলেজ জীবনে যে ছাত্রীটির কাছে সব বিষয়ে হার স্বীকার করতে হয়েছে, আজ তার অস্তিত্বটাই স্বীকার করতে চায় না। মনে মনে বললুম—তুমি জানতেও পারলে না পর্ণা, তোমার যে

সহপাঠিনীকে আজ তুমি চিনতে চাইছ না—যার সৌন্দর্যে আজও ঈর্ষান্বিত হয়ে তুমি ব্যঙ্গবিদ্রূপ করছ, সেই মেয়েটির উদারতাতেই আজ তোমার রান্নাঘরে দুবেলা উনুন জ্বলে!

—তা আপনি এই সুনন্দা চ্যাটার্জিকে চেনেন নাকি স্যার?

আমি এ প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে বলি—এই চিঠিগুলো টাইপ করে আনুন!

মেয়েটি বুদ্ধিমতী। তৎক্ষণাৎ চিঠির কাগজগুলো নিয়ে সরে পড়ে।

বুঝলুম, মেয়েটি নির্জলা মিথ্যা কথা বলেছে। মফঃস্বলের গভর্ণমেণ্ট কলেজ। কোয়েডুকেশন ছিল। সুতরাং ছাত্রী ছিল মুষ্টিমেয়। নন্দার কাছে গল্প শুনেছি—তার নাম ছিল 'কুলেজ-কুইন'। ফার্স্ট-ইয়ার থেকে ফোর্থ-ইয়ার পর্যন্ত প্রত্যেকটি ছেলে, মায় দপ্তরী বেয়ারাগুলো পর্যন্ত চিনতো তাদের কলেজ-কুইনকে। আর মিস্ রয় তার সহপাঠিনী হয়ে তাকে চিনবে না, এ হতে পারে না। পর্ণা নিশ্চয় জানে না যে, ঐ সুনন্দাই তার 'বসের' ঘরণী; জানলে এ সুরে কথা বলত না সে কিন্তু তা হলেও পর্ণার হিংসুটে মনের কী কদর্য রূপটাই দেখতে পেলুম মুহূর্তে। ওর প্রতি যেটুকু করুণা সঞ্চারিত হয়েছিল তা ভেসে গেল ওরই কথায়। প্রভু-ভৃত্য ছাড়া ওর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখা চলবে না। কিন্তু না! সে সম্পর্কও ছিন্ন করতে হবে। যে মেয়ে য়ুনিভার্সিটির ডিগ্রি জাল করতে পারে তাকে অফিসে রাখা চলে না।

রাত্রে সব কথা নন্দাকে খুলে বলি। নন্দা যেন জ্বলে ওঠে—কী বললে? হুলো বেড়ালের মত?

আমি বলি—আহাহা, সে তো আর তোমাকে বলেনি।

—আমাকে না তো আর কাকে?

—যাক, আমার কি মনে হয় জান? মেয়েটি সত্যিই পাশ করতে পারে নি। তাই বললে ডিগ্রি সার্টিফিকেটখানা পাকিস্তানে আছে।

—তাতে আর সন্দেহ কি?

—আমি খোঁজ নিয়ে বার করব।

—কোথায় খোঁজ নেবে ?

—তাই তো ভাবছি।

—খোঁজ অবশ্য তুমি য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীতেই পেতে পার। কিন্তু আমি কি বলি জান ? থাক্ না। খুঁচিয়ে ঘা করে কি লাভ ? দুটো পয়সা করে খাচ্ছে। তুমি বলছ, এতে জেল পর্যন্ত হতে পারে ?

—হতে পারে মানে ? হবেই।

—তবে থাক্। আমরা বরং ধরে নিই পর্ণা সত্যি কথাই বলেছে !

আমি বলি—দেখ নন্দা, স্যার ফিলিপ সিড্‌নি বলেছেন—'দ্য ওন্‌লি ডিস্‌এ্যাডভানটেজ অফ এ্যান অনেস্ট হার্ট ইজ ক্রেডুলিটি।' অর্থাৎ কিনা, মহৎ হৃদয়ের একমাত্র অসুবিধা হচ্ছে তার বিশ্বাস-প্রবণতা। তোমার অন্তঃকরণ মহৎ, তাই তুমি অন্ধ বিশ্বাস করতে চাইছ। কিন্তু বিজনেসে অন্ধ-বিশ্বাসের স্থান নেই।

নন্দা মাথা নেড়ে বলে—তা নয় গো। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। সে আমার শত্রুতা করেছে আজীবন, আজও করছে। তা করুক। আমি ওকে ক্ষমা করতে চাই !

ওকে বাহুবন্ধনে জড়িয়ে বলি—'দ্য ফাইন এ্যাণ্ড নোবল ওয়ে টু ডেসট্রয় এ ফো, ইজ টু কিল হিম্; উইথ কাইণ্ডনেস য়ু মে সো চেঞ্জ হিম দ্যাট হি শ্যাল সীজ টু বি সো ; দেন হি ইজ শ্লেন !'—বল তো কার কথা ?

নন্দা নির্জীবের মতো বলে—জানি না।

আমি বলি—এ্যালেইনের। কিন্তু মিস্ রয় তো আমার 'ফো' নয়, আমার স্টাফ। আমাকে খোঁজ নিতেই হবে। অন্যায় যদি সে করে থাকে তাহলে শাস্তিও পেতে হবে তাকে। বিশেষ, জেনে হোক না জেনে হোক, সে তোমাকে অপমান করেছে।

নন্দা কোনও কথা বলে না।

পরদিন মিস্ রয় সকল সংশয়ের উপর যবনিকাপাত করল। ছাপানো গেজেট এনে প্রমাণ করল যে, সে প্রাইভেটে বি. এ. পাশ করেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান ছিল তার। রাজবন্দী হিসাবে সে পরীক্ষা দেয়।

সংবাদটা সুনন্দাকে দিলুম। এবারও সে কোন কথা বলল না।

॥ দুই ॥

কাজটা বোধহয় ভালো করিনি। অবশ্য এখন আর ভেবে কি হবে? কেন এ কাজ করলাম? কিন্তু করব নাই বা কেন? এইতো স্বাভাবিক। ভাগ্য বিড়ম্বনায় আজ ও বেচারী নেমে গেছে অনেক নিচে। দু মুঠো অন্নের জন্য বেচারীকে কত দরখাস্ত করতে হয়েছে। আর আমি আজ উঠে এসেছি ওর চেয়ে অনেক উঁচুতে। অথচ একদিন আমরা একই ক্লাসে বসতাম। একই বেঞ্চিতে। আমি আজ ওকে দয়া না করলে কে করবে?

যেদিন অলক দরখাস্তের বাণ্ডিলটা আমাকে এনে দিল সেদিন কি স্বপ্নেও ভেবেছিলাম, ওর মধ্যে আছে একটি দীন আবেদন—মিস্ পর্ণা রায় করুণ ভাবে ভিক্ষা করছে একটি চাকরি—মিসেস্ সুনন্দা মুখার্জির স্বামীর কাছে? জানলে ও নিশ্চয়ই এখানে দরখাস্ত করত না। করত না? নিশ্চয়ই করত! যে রকম নির্লজ্জ আর হ্যাংলা প্রকৃতির মেয়ে ও—ঠিক এসে ধর্না দিত আমার কাছে। সোজাসুজি এসে ধরত আমাকে। কি বলতাম? বলতাম 'আমি দুঃখিত। চাকুরি-প্রার্থিনীদের যোগ্যতা বিচারের ভার যাঁর উপর তিনিই দেখে নেবেন। এ বিষয়ে কোনও অনুরোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।' ম্লান হয়ে যেত ওর মুখটা। কিন্তু না, ও যদি জানতে পারতো যে, যে ছিল কলেজ-জীবনে তার চরমতম শত্রু সেই সুনন্দা চ্যাটার্জির স্বামীই হচ্ছেন এই অলক

মুখার্জি—তাহলে হয়তো ও এই চাকরির জন্য দরখাস্তই করত না। আমার তো বিশ্বাস আজও যদি সে ওকথা জানতে পারে তাহলে চাকরিতে ইস্তফা দেবে। তাই জানতে ওকে আমি দেব না। অর্থাৎ ভালো করে একদিন ওকে জানিয়ে দেব সেকথা।

সেদিন দরখাস্ত দেখেই ওকে চিনতে পেরেছিলাম। নিঃসন্দেহ হলাম ছবি দেখে। কিন্তু পর্ণা রায় এখনও 'মিস্' কেন? তাহলে গৌতম ব্যানার্জি কোথায় গেল? তাছাড়া পর্ণা পাস করল কেমন করে? বছর পনেরো আগেকার কথা মনে পড়ছে। কী মধুর ছিল দিনগুলো! বোমার হিড়িকে আমরা সপরিবারে কলকাতা ত্যাগ করে আশ্রয় নিয়েছি মফঃস্বলের একটা শহরে। সে বছরই আমি আই. এ. পাস করলাম। বাবা কিছুতেই আর আমাকে কলকাতায় রাখবেন না। তাঁর বিশ্বাস জাপানীরা নাকি আমারই মাথায় ফেলবে বলে বোমা জমিয়ে রেখেছে। তাছাড়া কলকাতার বাড়িও তখন তালাবন্ধ। বাধ্য হয়ে নাম লেখালাম মফঃস্বলের সেই কলেজে।

শহরের একান্তে একটি রোমান ক্যাথলিক চার্চ। তার উল্টো দিকে ক্রিশ্চেন মিশনারী স্কুল। মাঝখান দিয়ে কালো পীচমোড়া রাস্তাটা চলে গেছে কলেজের দিকে। না, ভুল বললাম। আমরা যখন পড়তাম তখনও রাস্তাটা ছিল লাল—খোয়াবাঁধানো ধুলোর রাস্তা। প্রথম যেদিন ক্লাস করতে গেলাম, সেদিনটার কথা মনে আছে। ক্লাস নিচ্ছিলেন বি. আর. ডি. জি.। পুরো নামটা আজ আর মনে নেই। কলেজের সব অধ্যাপককেই আমরা নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে উল্লেখ করতাম। আমি দরজায় দাঁড়িয়ে ঘরে ঢুকবার অনুমতি চাইলাম। দেখলাম, সারা ক্লাসটা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আজ না হয় আমার বয়স হয়েছে—তখন আমি ছিলাম—যাকে বলে ডাকসাইটে সুন্দরী। ক্লাস ছুটি হতে মেয়েরা সব যেচে ভাব করতে এল আমার সঙ্গে। কদিনেই লক্ষ্য করলাম ছেলেগুলো আমাকে কেন্দ্র করেই ঘুরঘুর করছে। হাত থেকে রুমালটা পড়ে গেলে পাঁচটা ছেলের মাথা

ঠোকাঠুকি হয়ে যায়—কে আগে কুড়িয়ে দিতে পারে। অল্পদিনেই শুনতে পেলাম, আমার নতুন নামকরণ হয়েছে—'কলেজ-কুইন'।

কলকাতা কলেজের অভিজ্ঞতা ছিলই, বরং মফঃস্বলের ছেলেরা একটু মুখচোরা। তা হোক, তবু অল্প কিছুদিনের মধ্যেই প্রচারিত হয়ে গেল আমার কথা—শুধু সুন্দরী বলে নয়, ভালো ছাত্রী বলে, বেস্ট ডিবেটার বলে, টেবিল-টেনিস চ্যাম্পিয়ন বলে। আমার অপ্রতিহত গতির সামনে কেউ কোন দিন এসে দাঁড়াতে সাহস পায়নি। আমি কলেজে আসতাম একটি লেডিজ-সাইকেলে চেপে। প্রথম দিন ক্লাস ছুটি হবার পর দেখি চাকায় হাওয়া নেই। বুঝলাম কেউ দুষ্টুমি করেছে। কয়েকটি ছেলে গায়ে পড়ে সহানুভূতি জানাতে এল। পাম্প করে দেবার প্রস্তাব করল কেউ কেউ। আমি ধন্যবাদ জানিয়ে অস্বীকার করলাম। কলেজ থেকে অদূরে ক্রিশ্চানপাড়ার মোড়ে ছিল একটা সাইকেল সারানোর দোকান। সেখান থেকেই পাম্প করিয়ে নিলাম। দোকানদারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করলাম সেটা মাসিক এক টাকায় জমা রাখার। দু-একবার ক্লাসের বোর্ডে কলেজকুইনের নামে অহেতুক-উচ্ছ্বাস-মাখানো দু-এক লাইন কবিতা পড়েছি। গ্রাহ্য করিনি। বুঝতাম, এগুলোও আমার প্রাপ্য। কই আর কারও নামে তো কবিতা লেখা হয় না!

এই প্রসঙ্গে আলাপ হয়ে গেল একদিন গৌতম ব্যানার্জির সঙ্গে। সে এক অদ্ভুত ঘটনা। সেদিন একটু দেরি করে এসেছি। শুনলাম, আমি আসার আগে নাকি ক্লাসে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে! গিরীন ঘোষ বলে একজন গুণ্ডাপ্রকৃতির ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। সে নাকি বোর্ডে আমার নামে কি সব লিখছিল। করিডোর দিয়ে যেতে যেতে বুঝি নজরে পড়ে গৌতমের। সে ক্লাসে ঢুকে গিরীনকে বারণ করে। তখনও ছাত্রীবাহিনীর চালচিত্র পিছনে নিয়ে অধ্যাপকের মূর্তির আগমন ঘটেনি ক্লাসে। গিরীন রুখে ওঠে—'আমাদের থার্ড-ইয়ার ক্লাসে তো কেউ আপনাকে মাতব্বরি করতে ডাকেনি।'

গৌতম ফোর্থ-ইয়ারের ছাত্র ! সে বলে—'ওসব থার্ড-ইয়ারও বুঝি না—এসব থার্ড গ্রেড ইয়ার্কিও বুঝি না। ফোর্থ ইয়ারে ওঠেননি বলেই কিছু অভদ্রতা করবার মতো নাবালক নন আপনি !'

অল্প কথা-কাটাকাটির পরেই হাতাহাতি শুরু হয়ে যায়। গিরীনরা ছিল দলে ভারী। গৌতমই মার খেয়েছে বেশী।

গৌতম ছেলেটিকে চিনতাম—ফোর্থ ইয়ারের সেরা ছেলে। সব দিকেই বেশ চৌকস। যেমন দেখতে, তেমনি পড়াশুনায়। আলাপ ছিল না ওর সঙ্গে—না থাক, ঠিক করলাম ছুটির পরে ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে ধন্যবাদ জানাব। ছুটির পর খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, গৌতম ফার্স্ট এইড নিয়ে বাড়ি চলে গেছে।

দেখা হল পরের দিন। সে দিনটার কথা ভুলব না। থার্ড পিরিয়ড অফ্ ছিল। বসেছিলাম মেয়েদের কমনরুমে। ঘরটা প্রফেসরদের ঘরের সংলগ্ন। কলেজপ্রাসাদের একান্তে। জানালা থেকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ খেলার মাঠটা। মাঠের ওপাশে মিশনারী স্কুলের গির্জা। ক্রিশ্চানপাড়ার ঘরগুলি দেখা যায়। জানালার পাশেই একটা অশোকগাছ। বসন্ত চলে গেছে, তবু আজও ওর বসন্ত-বিদায় পর্ব শেষ হয়নি—ডালে ডালে লেগে আছে আবীরের ছোঁওয়া। গরম পড়তে শুরু করেছে। খেলার মাঠের উপর তাপদগ্ধ প্রান্তরের দীর্ঘশ্বাস কেঁপে কেঁপে উঠছে আকাশের দিকে। কোথায় একটা হতভাগা কোকিল স্থান-কাল-পাত্র ভুলে একটানা ডেকে চলেছে এই তপোবনে। একপাল মহিষ চলে গেল ধুলো উড়িয়ে—গলায় বাঁধা ঘণ্টার ঠন্ ঠনাঠন্ স্তব্ধ মধ্যাহ্নের অলসতার সঙ্গে সুন্দর ঐক্যতান রচনা করল। মনটা কেমন উদাস হয়ে ওঠে। কমনরুমটা খালি। মেয়েরা জোড়ায় জোড়ায় বাগানে ঘুরছে। কোন কোন ভাগ্যবতীর আবার বান্ধবীর বদলে বন্ধুও জুটে গেছে। অশোকতলায় একটু দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে ওদের। হঠাৎ নজরে পড়ল ফোর্থ-ইয়ারের গৌতম কয়েকটি ছেলের সঙ্গে বেরিয়ে আসছে ল্যাবরেটারী থেকে। উত্তেজিতভাবে কি একটা

আলোচনা করতে করতে ওরা চলে যাচ্ছে লাইব্রেরীর দিকে। এতদিন ভালো করে লক্ষ্য করিনি ভদ্রলোককে। আজ দেখলাম! ফর্সা রঙ —চুলগুলো পিছনে ফিরানো, চোখে একটা মোটা ফ্রেমের চশমা। গায়ে একটা সাদা চুড়িদার পাঞ্জাবি, হাতাটা গোটানো। হাতে ল্যাবরেটারীর খাতা, কাঁধে অ্যাপ্রন। বেয়ারাটার হাতে একটা স্লিপ দিয়ে ডেকে পাঠালাম।

বেয়ারাটা চলে যেতেই কেমন যেন লজ্জা করে উঠল। কেন এ কাজ করলাম? ভদ্রলোককে আমি চিনি না, মানে আলাপ নেই। এভাবে ডেকে পাঠানোটা কি ঠিক হল? কমনরুমের ও প্রান্তে ইতিমধ্যে কয়েকটি মেয়ে এসে বসেছে। তাই বেরিয়ে এলাম করিডোরে। দেখি বেয়ারার হাত থেকে ও কাগজটা নিল; ঝুঁকে পড়ল ওর বন্ধুরা কাগজটা দেখতে। আলোচনাটা থেমে গেছে ওদের। একজন কি একটা কথা বললে, ওরা সমস্বরে হেসে ওঠে। আর একজন গৌতমের পিঠে একটা চাপড় মারে। গৌতমকে খুব গম্ভীর মনে হচ্ছে। ও চশমাটা খুলল, রুমাল দিয়ে কাঁচটা মুছে ফের চোখে দিল। কি যেন জিজ্ঞাসা করল বেয়ারাটাকে, সে হাত দিয়ে আমাকে দেখাল।

গৌতম ধীরে ধীরে এগিয়ে এল আমার দিকে।

—'আপনি আমাকে ডাকলেন?'

—'হ্যাঁ, মানে, কিছু মনে করবেন না। আপনার সঙ্গে আমার আলাপ নেই, তবু মনে হল আপনাকে ডেকে আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

—'ধন্যবাদ! হঠাৎ খামখা আমায় ধন্যবাদ দেবেন কেন?'

—'কাল নাকি আপনি আমারই জন্যে আহত হয়েছিলেন?'

—'আপনার জন্য? কই না তো!'

চমকে উঠলাম। ও অস্বীকার করতে চায় কেন ঘটনাটাকে? খবরটা আমি অনেকের কাছেই শুনেছি—কোন সন্দেহ ছিল না। তাই

জোর দিয়ে বললাম—'কাল গিরীনবাবুর সঙ্গে আপনার—'

—'ও হ্যাঁ, তা তার সঙ্গে আপনার কি সম্পর্ক ?'

—'আমার নামেই গিরীনবাবু বোর্ডে লিখছিলেন—'

—'তাই নাকি, তা আপনার নামটা কি ?'

—'সুনন্দা চ্যাটার্জি।'

—'কই ও নাম তো লেখেনি গিরীন !'

—'না, নামটা না লিখলেও আমাকেই মীন করেছিল।'

—'কি করে জানলেন ? আমার যতদূর মনে আছে কোন মেয়ের নামই সে লেখেনি। লিখেছিল 'কলেজ-কুইনের' নামে দু-লাইন কবিতা। তা আপনি কেন ভাবছেন যে, আপনাকেই মীন করেছিল ?'

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে ওর ন্যাকামি দেখে। যেন কিছুই জানে না ! বললাম—'আমি কি ভাবছি সেটা কথা নয়—ক্লাসশুদ্ধ মেয়ে ভেবেছিল যে আমাকেই মীন করা হয়েছে।'

—'ক্লাসসুদ্ধ মেয়ে মোটেই তা ভাবেনি। সবাই ভেবেছিল—ঠিক আপনি যা ভেবেছেন। কারণ প্রত্যেক মেয়েই ভাবে সেই বুঝি কলেজ-কুইন। আর মেয়েদের এই রকম ভ্রান্ত ধারণা আছে বলেই ছেলেরা ঐ রকম অসভ্যতা করে। ছেলেদের অসভ্যতাটা প্রকাশ্যে, কিন্তু তাতে ইন্ধন যোগায় মেয়েরাই। সিল্কের শাড়ি পরে আর একগাদা রঙ মেখে সং সেজে কলেজে আসতে তাদের সংকোচ হয় না বলেই ছেলেরাও বাড়াবাড়ি করে।'

এর চেয়ে স্পষ্টভাবে আর কি করে অপমান করা যায় ? আমার পরিধানে সেদিন ছিল সিল্কের শাড়ি। প্রসাধনটা নিখুঁত না হলে আমি বাড়ির বার হই না—কলেজেও আসতে পারি না।

রাগে অপমানে আমার কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে থাকে। একটা কথাও বলতে পারি না। ঘণ্টা পড়ে গিয়েছিল। দলে দলে সবাই বেরিয়ে আসছে ক্লাস থেকে। গৌতম হয়তো আরও কিছু বলত, হঠাৎ আমার ওপাশ থেকে একটি মেয়ে এগিয়ে এসে বলে—'কি

হচ্ছে গৌতম! তুমিও কাণ্ডজ্ঞান হারালে নাকি? মেয়েদের কমনরুমের সামনে দাঁড়িয়ে—'

বাধা দিয়ে গৌতম বলে—'আমি এখানে স্বেচ্ছায় আসিনি পর্ণা। আমাকে এখানে ডেকে আনা হয়েছে।'

স্লিপ কাগজটা পর্ণার দিকে বাড়িয়ে ধরে সে। পর্ণা হাত বাড়িয়ে কাগজটা নিতেই গটগট করে গৌতম চলে যায়। পর্ণা আমার দিকে ফিরে বলে—'কিছু মনে করবেন না। গৌতম একটু অন্য জাতের ছেলে। আমি ওর হয়ে ক্ষমা চাইছি।'

আমি বলি—'মাপ চাইবার কি আছে? আর তাছাড়া গৌতম-বাবুর হয়ে আপনিই বা মাপ চাইবেন কেন?'

পাশ থেকে মীরা সেন বলে—'তাতে কোন দোষ হয় না। গৌতমবাবুর হয়ে মাপ চাইবার অধিকার আছে পর্ণার; ওরা দুজনে বুসম্-ফ্রেণ্ড।

পর্ণা ওর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকায়; বলে—'হ্যাঁ, ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমরা, সে কথা অস্বীকার করি না; এবং সে কথা তোমরা বললেও আমি আপত্তি করব না, তবে আমি আশা করব ভদ্রতর বিশেষণ ব্যবহার করবে তোমরা আমাদের বন্ধুত্বটা বোঝাতে!'

পর্ণা মেয়েটিকে ইতিপূর্বে ক্লাসে দেখেছি—লক্ষ্য করিনি। লক্ষ্য করে কিছু দেখবার মতো ছিল না বলেই সম্ভবত দেখিনি ওকে। ও আমারই মতো এসেছে কলকাতার কলেজ থেকে ট্রান্সফার নিয়ে। পাতলা একহারা চেহারা। শ্যামলা সাধারণ বাঙালীঘরের মেয়ে। আশ্চর্য, ঐ মেয়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেছে গৌতম ব্যানার্জি।

মেয়েটিকে দ্বিতীয়বার স্বীকার করতে হল ফার্স্ট টার্মিনালের রেজাল্ট বের হবার পর। ওরও ছিল বাঙলায় অনার্স। ও না থাকলে আমিই প্রথম হতাম ক্লাসে। সেই দিন থেকে শুরু হল আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। প্রতিজ্ঞা করলাম, যেমন করে হোক ওর চেয়ে বেশী নম্বর পেতেই হবে। ক্রমশ পড়াশুনা ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও ওর সঙ্গে

ঠোকাঠুকি বাধতে শুরু হল। ক্লাসের মধ্যে দেখা দিল দুটি শিবির। সুনন্দা চ্যাটার্জি আর ক্লাসে একচ্ছত্র সম্রাজ্ঞী থাকল না। শাড়ি-গহনা, রুজ-লিপস্টিক, লেডিজ-সাইকেল এবং সর্বোপরি আমার রূপের সম্ভার সত্ত্বেও ক্লাসের সব মেয়েকেই আমার দলে রাখতে পারলাম না। কারণটা সহজেই অনুমেয়। ওদের দলে টানবার জন্য যেগুলো ছিল আমার অস্ত্র, সেইগুলোকেই আবার ঈর্ষা করত অনেকে। তারা যোগ দিল বিপক্ষ শিবিরে। সেদিন থেকে আমার ব্রত হল পদে পদে ওকে জব্দ করা, অপদস্থ করা, পরাস্ত করা।

আজ জনান্তিকে এই ডায়েরির পাতায় স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে পারিনি। কোনও ক্ষেত্রেই তাকে হারাতে পারিনি—অথচ সব বিষয়েই আমি ছিলাম শ্রেষ্ঠতর। আশ্চর্য মেয়েটা। পাতলা ছিপছিপে শ্যামলা সাধারণ মেয়ে। রঙীন শাড়ি কেউ তাকে কোনদিন পরতে দেখেনি। একহাতে একগাছি চুড়ি, অপর হাতে রিস্টওয়াচ। চুপ করে বসে থাকে ক্লাসে,—নোট নেয় না—কমনরুমে আসে না। লাইব্রেরীতে দেখা যায় ওকে প্রায়ই—একা বসে বই পড়ছে। আমি মনে মনে তাল ঠুকি—কিন্তু ওকে হারাবো কি করে? ও টেবিল-টেনিস খেলতে আসে না। স্যোসালে গান গাইবে না—শাড়ি-সজ্জা-সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতায় পর্ণা আমাকে ওয়াক-ওভার দেয়। সম্মুখ-সমরে কিছুতেই নামবে না সে। প্রবলতর সম্রাট হয়েও আলমগীর যেমন পার্বত্য-মূষিকের কাছে বারে বারে ঘা খেয়েছিলেন—আমারও হল সেই হাল! আজ তাই তাকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছি আমার দরবারের মাঝখানে! এখানে ছোট দরজার মধ্যে দিয়ে আমার রাজসভায় তাকে প্রবেশ করতে হবে—মাথা আপনিই নত করতে হবে ওকে। কিন্তু প্রতিশোধের কথা পরে। প্রথমে পরাজয়ের কথাগুলি অকপটে স্বীকার করতে হবে ডায়েরির পাতায়। প্রথম খণ্ডযুদ্ধের কথা বলছি,—টার্মিনাল পরীক্ষার খাতা। দ্বিতীয় পরাজয়ের কাহিনীটা

আরও মর্মন্তুদ। হঠাৎ কি করে খবর রটে গেল পর্ণা রাজনীতি করে। সে যুগে রাজনীতি করতে হত গোপনে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা তখনও রুদ্ধকারার অন্তরালে। শুনলাম, ছাত্র-য়ুনিয়ানের নির্দেশ এসেছে একদিন হরতাল হবে; কারণটা আজ আর মনে নেই। কলকাতায় বুঝি গুলি চলেছে; তারই প্রতিবাদে হরতাল হচ্ছে। আমাদের কলেজেও ছাত্র য়ুনিয়ান ছিল। তারা ধর্মঘট ঘোষণা করল একদিনের জন্য। পর্ণা নাকি ছিল এই ধর্মঘটের একজন গোপন পাণ্ডা। কলেজ থেকে আমরা দলে দলে বেরিয়ে এলাম। অশোকগাছতলায় বিরাট ছাত্র সমাবেশ হল। গৌতম ছিল ছাত্রনেতা; সেই সভাপতিত্ব করল। আমি ভালো বক্তৃতা করতে পারতাম। ডিবেটিঙে প্রাইজ চিরকাল বাঁধা ছিল আমার। ঠিক করলাম আজ পর্ণাকে হারাতে হবে। দেখি কার বক্তৃতায় লোকে অভিভূত হয়। ও বসেছিল সভাপতির পাশেই—প্রায় গা-ঘেঁষে! সভা শুরু হতেই গৌতম আজকের ধর্মঘটের কারণটা সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিল। তারপর সমবেত ছাত্র-ছাত্রীদের কিছু বলতে বলল। যেমন সাধারণত হয়ে থাকে—কেউই প্রথমটা এগিয়ে আসে না! এই সুযোগ। আমি এগিয়ে গেলাম। বললাম—'আমি কিছু বলতে চাই।'

গৌতম চোখ থেকে চশমাটা খোলে। স্বভাবসিদ্ধভাবে কাচটা মোছে। পর্ণার সঙ্গে ওর দৃষ্টি বিনিময় হয়। তারপর ও বলে—'বেশ তো, বলুন।'

মনে আছে, ঝাড়া তিন কোয়ার্টার বক্তৃতা করেছিলাম। বৃটিশ ইম্পিরিয়ালিজম্, নাজিজম্, ফ্যাসিজম্, কংগ্রেস, গান্ধী, সুভাষ বোস, জনযুদ্ধ—কাউকেই বাদ দিইনি। ঘন ঘন হাততালিতে মুখরিত হয়ে উঠল সভাস্থল। সে কী উদ্দীপনা ছাত্রদের মধ্যে! আমার পরনে ছিল লালরঙের একটা শান্তিপুরী শাড়ি, লাল ব্লাউজ, কপালে একটা লাল টিপ। বাতাসে আমার আঁচল উড়ছে, অবাধ্য কোঁকড়া চুলগুলো

কপালের উপর বারে থেকে বারে ঝুঁকে পড়ে। হাত নেড়ে বক্তৃতা করেছিলাম—'মনে রাখবেন এ যুদ্ধে এক পাই নয়, এক ভাই নয়।'

দীর্ঘ বক্তৃতার পর যখন আসন গ্রহণ করি, তখন মুহুর্মুহু করতালিতে সকলে আমাকে অভিনন্দিত করল। আঁচল দিয়ে মুখটা মুছে বসে পড়ি। পাশ থেকে কে একজন বলল—'এর পর আর কেউ কিছু বলতে সাহস পাবে না বোধহয়।'

সত্যিই কেউ এল না। গৌতম বলল—'সুনন্দা দেবী যে সব কথা বললেন, যদিও আদর্শগতভাবে আমি তার সঙ্গে সব বিষয়ে একমত নই, কিন্তু রাজনৈতিক তর্ক আমরা এখানে করতে আসিনি। যেখানে আমরা একমত শুধু সেখানেই হাত মেলাব আজ আমরা। এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ কি না সে প্রশ্ন আজ নাই তুললাম! আজকে আমাদের প্রতিবাদ বৃটিশ বুরোক্রাসীর বিরুদ্ধে। যাই হোক, সুনন্দা দেবীকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা শেষ করছি আমি।'

পর্ণা সাহস করে বক্তৃতা দিতেই ওঠেনি!

ভেবেছিলাম সর্বসমক্ষে এতবড় পরাজয় আর হতে পারে না পর্ণার। জীবনের সব ক্ষেত্রে তাকে হটিয়ে দিয়েছি—সে মেতে ছিল রাজনীতি নিয়ে। আজ সেখান থেকেও গদিচ্যুত করলাম তাকে।

ভুল ভাঙল পরদিন। গৌতম আর পর্ণাকে পুলিসে অ্যারেস্ট করেছে! আর আমার দীর্ঘ তিন-কোয়ার্টারব্যাপী বক্তৃতাটা গোয়েন্দা পুলিস গ্রাহ্যই করেনি!

ওরা অবশ্য ছাড়া পেয়েছিল কয়েকদিন পরেই। পুলিস কেস চালায়নি। তা চালায়নি—কিন্তু আমাকে পুলিস অহেতুক অপদস্থের চূড়ান্ত করে গেল!

আমি নতুন উৎসাহে জ্বলে উঠলাম। সক্রিয় রাজনীতিতে যোগ দিলাম। অন্তত একবারও যদি আমাকে ধরে নিয়ে যেত পুলিসে! কিন্তু হতভাগা গোয়েন্দাপুলিসগুলোর যদি এতটুকু ভদ্রতাজ্ঞান থাকে!

তবু ফল ফলল আমার পরিশ্রমের। গৌতম আমাকে একদিন

ডেকে বলল—'শুনুন, সেদিন বক্তৃতায় আপনি 'জনযুদ্ধ' সম্বন্ধে কয়েকটা মন্তব্য করেছিলেন। সে নিয়ে সেদিন আমি কোনও কথা বলিনি। আপনার আপত্তি না থাকলে বিষয়টা আমি বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই।'

আমি বললাম—'আপত্তি কি? বেশ তো, আসবেন আজ বিকালে আমাদের বাড়িতে, আলোচনা করব।'

এই সূত্রে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতা হল গৌতমের সঙ্গে। অতি ধীরে বিস্তার করলাম জাল। সে জালে ধরা না দিয়ে উপায় নেই আঠারোটি বসন্তের আশীর্বাদে আমার সে জাল তখন ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারত! গৌতমেরও তখন সেই বয়স—যে বয়সে ছেলেরা পালতোলা নৌকা দেখলেই পা বাড়িয়ে দেয়। তারপর কোথায় কোন কূলে তরী ভিড়বে সে খেয়াল রাখে না—নিরুদ্দেশ যাত্রা হলেও পরোয়া করে না। তিল তিল করে জয় করেছিলাম ওকে—আমার উদ্দেশ্য ছিল পর্ণার কবল থেকে ওকে মুক্ত করা। সাধ্য কি সেই পাতলা ছিপছিপে মেয়েটির, ওকে আটকে রাখে! তারপর কখন নিজের অজান্তেই হঠাৎ লক্ষ্য করলাম এ তো আর অভিনয় নয়—সত্যিই ওকে ভালবেসে ফেলেছি! একদিন যদি বিকালে ও না আসতো, মনে হত সন্ধ্যাটা বুঝি বৃথা গেল! পর্ণাকে হারানোই ছিল লক্ষ্য—লক্ষ্য করলাম, গৌতমকে হারানোর ভয়টাই হয়ে উঠল প্রধান। প্রসাধনটা আমি কমিয়ে দিয়েছিলাম। শাড়ি-গহনার আর আড়ম্বর ছিল না আমার সাজপোশাকে। বুঝেছিলাম, গৌতম তাই ভালবাসে। আমার রূপের আগুনে ঝাঁপ দিল ও। আমার সঙ্গে ওর নাম জড়িয়ে নানা কথার রটনা হল কলেজে। ভ্রূক্ষেপও করলাম না আমরা। এ নিয়ে পর্ণা কি একটা কথা বলতে এসেছিল গৌতমকে, শুনলাম এই প্রসঙ্গে ওদের মনোমালিন্য ঘটেছে—এবং ফলে দুজনের কথাবার্তাও বন্ধ হয়ে গেছে।

এই পর্যায়েই পর্ণার সঙ্গে বাধল আমার নূতন সংঘাত। কলেজ-

য়ুনিয়ানে একটি আসন সংরক্ষিত ছিল ছাত্রীদের জন্য। কলেজ ম্যাগাজিনের সহ-সম্পাদকের আসন। নির্বাচন প্রতিযোগিতায় দেখা গেল দুজন প্রতিদ্বন্দ্বী—সুনন্দা চ্যাটার্জি আর পর্ণা রায়। ইলেকশনের ব্যাপারে পর্ণা আর গৌতমের মনোমালিন্যটা দেখা দিল প্রকাশ্য শত্রুতার রূপে। দু পক্ষ থেকেই প্রচারকার্য চালানো হচ্ছিল—যেমন হয়ে থাকে। গৌতম বেপরোয়া ছেলে, সে প্রকাশ্যেই খরচ দিয়ে আমার নামে পোস্টার ছাপাল। মাইক ভাড়া করে এনে প্রচার চালাল—রেস্তোরাঁয় ভোটারদের করালো আকণ্ঠ ভোজন। বড়লোকের ছেলের খেয়াল! অপর পক্ষ, অর্থাৎ পর্ণার দল খান কয়েক হাতে-লেখা প্রাচীরপত্র টাঙিয়ে দিল এখানে ওখানে। হঠাৎ গৌতমের বুঝি নজরে পড়ে, কোথায় একটা পোস্টারে আমার সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে অশ্লীল কিছু ইঙ্গিত করা হয়েছে। গৌতম গিয়ে পর্ণাকে সোজা এ নিয়ে অভিযুক্ত করে। উত্তরে পর্ণাও কয়েকটি গরম গরম কথা বলে জানিয়ে দেয় যে, তার রুচি অত নীচ নয়—সে এসব ব্যাপারের কিছুই জানে না। গৌতম বিশ্বাস করে না। ফলে ওদের ঝগড়াটা আরও বেড়ে যায়।

গৌতম ছিল ছাত্রমহলের বড় দরের পাণ্ডা। সুতরাং জয় সম্বন্ধে একরকম নিশ্চিন্ত ছিলাম। আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, গৌতমের অ্যাকাউন্টে চর্ব-চূষ্য খেয়ে এসে ওর বন্ধুরা ভোট দিয়ে আসবে পর্ণাকে! কিন্তু তাই দিয়েছিল ওরা। ভোট-গণনার পর দেখা গেল অর্থব্যয় আর অপমান ছাড়া কিছুই জমা পড়েনি আমার অঙ্কে!

অনেকেরই ঈর্ষার পাত্র ছিলাম আমরা দুজন। ছাত্র এবং ছাত্রীমহলে। ওরা পর্ণার স্বপক্ষে ভোট দিয়েছিল—তার আসল কারণ—কোন ক্ষেত্রে অপর প্রার্থীর 'রূপের দেমাক', কোনও ক্ষেত্রে অপর প্রার্থীর পক্ষে সুপারিশকারীর 'বড়লোকি চাল'!

দিন তিনেক কলেজে যেতে পারিনি, লজ্জায় সংকোচে।

চতুর্থ দিন গৌতম এসে বলল—'কদিন বাড়ি থেকে বের হইনি। কলেজের কি খবর?'

আমি বললাম—'সেকি! আমিই তো ভাবছি তোমার কাছ থেকে খবরটা জেনে নেব। আমিও আজ তিন দিন কলেজ যাইনি যে।'

ও হাসল। ভারি ম্লান, অপ্রতিভ দেখাচ্ছিল ওকে। বলল—'আমি স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি যে, শেষ পর্যন্ত হেরে যাব আমরা। তোমার ভারি ইচ্ছে ছিল ম্যাগাজিনের সহ-সম্পাদিকা হবার, নয়?

আমি বললাম—'সে কি তুমি বোঝ না? আমি বোধহয় আমার একখানা হাত কেটে ফেলতে রাজী ছিলাম এ জন্যে।'

ও চুপ করে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর হঠাৎ উঠে পড়ে বলে—'চললাম।'

আমি বলি—'সেকি! এরই মধ্যে?'

—'হ্যাঁ, কাল কলেজে দেখা হবে।'

পরদিন কলেজে ঘটল একটা অদ্ভুত ব্যাপার। টিফিন-আওয়ার্সে আমাকে ডেকে পাঠালেন প্রিন্সিপ্যাল। বললেন—'তোমাকে আমি ম্যাগাজিন-কমিটির সাব-এডিটর নমিনেট করেছি।'

আমি চমকে উঠে বলি—'সে কি স্যার, আমি তো ইলেকশনে হেরে গেছি। এখন আবার নমিনেশন কিসের?'

প্রিন্সিপ্যাল গম্ভীর হয়ে বলেন—'সব কথা তো বলা যাবে না, পর্ণা রিজাইন দেবে।'

বুঝলাম সরকারী নির্দেশ এসেছে নিশ্চয়ই এই মর্মে। পর্ণার নাম লেখা আছে কালো খাতায়। কলেজ-ম্যাগাজিনে তাকে রাখা যাবে না। পিছনের দরজা দিয়ে এভাবে ঢুকতে আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না—কিন্তু অধ্যক্ষের অনুরোধ এড়াতে পারলাম না। রাজী হতে হল আমাকে। য়ুনিয়ানের নবনির্বাচিত সভ্যদের মিলিত গ্রুপ ফটো তোলা হল—আমাকে বসানো হল মধ্যমণিরূপে প্রিন্সিপ্যালের পাশেই।

এর প্রায় দিন সাতেক পরে অপ্রত্যাশিতভাবে পর্ণা এসে দেখা

করল আমার সঙ্গে। ওর দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

—'আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা ছিল।'

—'আমার সঙ্গে! বেশ বলুন।'

ও কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করে বলে বসে—'আপনি গৌতমকে ছেড়ে দিন।'

হো হো করে হেসে উঠি আমি। এতদিনে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়েছে। ওর অপ্রস্তুত ভাবটা রসিয়ে রসিয়ে উপভোগ করি, চিবিয়ে চিবিয়ে বলি—'গৌতম কি আমার বাঁধা গরু যে গেরো খুলে দিলেই আপনার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে?'

এক মুহূর্ত ও জবাব দিতে পারে না। তারপর সামলে নিয়ে বলে—'আপনার কাছে এটা নিছক খেলা—কিন্তু আমার কাছে এটা কতটা মর্মন্তুদ তা কি আপনি আন্দাজ করতে পারেন না!'

—'কি করে পারব বলুন? আমার তো 'বুসম্-ফ্রেণ্ড' নেই!'

এবার বিশেষণের জ্বালাটা গলাধঃকরণ করতে হল ওকে। বলল—'আমি অযাচিতভাবে আপনার কাছে এসেছি—এভাবে অপমান করলেও অবশ্য আমার কিছু বলার নেই, কিন্তু—'

মনে হল সত্যিই বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে এটা। ভদ্রতায় বাধছে।

বললাম—'কিন্তু আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন? অবশ্য আমার কাছে সাহায্য চাইতে আসার অধিকার আছে কিনা সেটা আপনারই বিচার্য।'

ও বলল—'এতদিন বলতে আসিনি। সম্প্রতি আমি আপনার একটা উপকার করেছি—এবং আমার দান আপনি অম্লানবদনে হাত পেতে গ্রহণ করেছেন, তাই বিনিময়ে আমার সাহায্য চাইবার অধিকার জন্মেছে বলেই বিশ্বাস করেছি আমি।'

একটু অবাক হয়ে বলি—'ঠিক বুঝলাম না তো, আপনি আমার কোন উপকারটা করেছেন?'

—'কলেজ-য়ুনিয়ানে সহ-সম্পাদিকার পদটা আপনাকে ছেড়ে দিয়েছি।'

—'ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছেন বলুন।'

—'হ্যাঁ, বাধ্য হয়েছি—কিন্তু সে তো আপনারই স্বার্থে।'

—'আমারই স্বার্থে! বলেন কি? প্রিন্সিপ্যাল কি আমারই স্বার্থে আপনাকে রিজাইন দিতে বাধ্য করেছিলেন?'

—'প্রিন্সিপ্যাল তো বলেননি।'

—'তবে?'

—'আমাকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছে গৌতম। কারণটা সে আমাকে বলে নি, শুধু বলেছিল আমি পদত্যাগ না করলে সে দুঃখিত হবে। কারণটা না বললেও সেটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম—আপনিও পেরেছেন আশা করি। তার অনুরোধই আমার কাছে আদেশ। তাই সরে দাঁড়িয়েছি আমি।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে যাই। ছি ছি ছি! গৌতমের যদি এতটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে! এইভাবে সে আমাকে ঢুকিয়েছে কলেজ-য়ুনিয়ানে! কোন্ লজ্জায় এরপরে কথা বলব পর্ণার সঙ্গে?

ও বলে—'আপনি কি প্রতিদানে ছেড়ে দেবেন ওকে?'

আমি বিরক্ত হয়ে উঠি—'কী বকছেন ছেলেমানুষের মতো! আমি কি আঁচলে বেঁধে রেখেছি ওকে? এ কি কেউ ছেড়ে দিতে পারে? এ কেড়ে নিতে হয়।'

ও এক মুহূর্ত চুপ করে থাকে। তারপর বলে—'এ যুদ্ধ ঘোষণায় আপনার কোনও বীরত্ব নেই কিন্তু। যুদ্ধেরও একটা 'আইন' আছে, সমানে সমানেই সেটা হয়ে থাকে। আপনি কি অন্যায় যুদ্ধ করছেন না?'

—'অন্যায় যুদ্ধ মানে?'

—'মানে আপনার হাতে আছে ঈশ্বরদত্ত ব্রহ্মাস্ত্র; তপস্যা করে তা পাননি আপনি—এ আপনার সহজাত কবচ-কুণ্ডল। আর আমি নিরস্ত্র। দুর্ভাগ্য আমার, গৌতমের চোখ আজ চকমকির ফুলঝুরিতেই অন্ধ—'

—'ঘিয়ের প্রদীপটার দিকে ওর নজর পড়ছে না, কেমন ? কিন্তু সেজন্য আমাকে দোষ দিয়ে কি হবে বলুন ? প্রদীপের কালির দিকে যদি গৌতমের নজর না পড়ে তবে তাকে দোষ দেবেন ; এবং ঈশ্বর যদি আপনাকে রূপ না দিয়ে থাকেন তবে তাঁর সঙ্গেই বোঝাপড়া করবেন। আর অন্যায় যুদ্ধের কথা বলেছেন আপনি—জানেন না জীবনের দুটি ক্ষেত্রে আইন বলে কোন কিছু নেই—'

—'তাই নাকি ?'

—'হ্যাঁ, তাই। 'দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন ল্যাভ অ্যাণ্ড ওয়ার।'

—'ও আচ্ছা। মনে থাকবে উপদেশটা। নমস্কার !'

—'নমস্কার !'

এর পর আর কোনদিন কথা হয়নি পর্ণার সঙ্গে।

পর্ণা অবশ্য চেষ্টাই করেনি গৌতমকে ছিনিয়ে নিতে—আমার ইন্দ্রজালের মোহ ভেদ কর[illegible]। সে জানতো তা অসম্ভব। সর্বান্তঃকরণে সে নেমে পড়ল রাজনীতি[illegible]। দিনরাত মেতে রইল ছাত্র-আন্দোলনে। কাটল আরও মাস ছয়েক। তারপর আমাদের ফাইনাল পরীক্ষার মাস খানেক আগে একটি ছাত্র-শোভাযাত্রা পরিচালনা করবার সময় গ্রেপ্তার হল সে। লাঠি চার্জ করেছিল পুলিস। গুরুতর আহত অবস্থায় ভ্যানে করে তুলে নিয়ে গেল পর্ণাকে রাজপথ থেকে। গৌতম ততদিনে পাস করে কলকাতায় পড়তে গেছে য়ুনিভার্সিটিতে। পর্ণা আহত হওয়ার কথা শুনে সে ফিরে আসে। পুলিস হাসপাতালে দেখা করতে যায় গৌতম। সেখানে তাদের কী কথাবার্তা হয়েছিল জানি না। কিন্তু সেখান থেকে সে বেরিয়ে এল—যেন একেবারে অন্য মানুষ। পর্ণা ছাড়া পেল না। পরীক্ষাও দেওয়া হল না ওর। বিনা বিচারে আটক হয়ে রইল। ক্রমে ক্রমে বদলে গেল গৌতমও। মাস তিনেকের মধ্যে তাকেও ধরে নিয়ে গেল পুলিসে।

আর ওদের কোনও খবর পাইনি।

কালে থেমে গেছে কালযুদ্ধ। আশা করেছিলাম, রুদ্ধকারার এ

পাশে এসে ওরা হাত মিলিয়েছে। আমি ভুলে যাবার চেষ্টা করেছিলাম জীবনের ওই অধ্যায়টাকে।

অলকের কাছে তাই সেদিন মিস্ পর্ণা রায়ের দরখাস্তটা দেখে বুঝতে পারিনি প্রথমটা। ভাবতেই পারিনি ওদের বিয়ে হয়নি। নিঃসন্দেহ হলাম ফটোটা দেখে। সেই চোখ, সেই মুখ, সেই চাপা হাসিটি লেগে আছে বিষাক্ত ঠোঁটের কোণায়। ফটোর মধ্যে থেকে ওর শ্বাপদ দৃষ্টি জ্বলজ্বল করছে!

কিন্তু কাজটা কি ভালো করলাম? সত্যিই কি ওর উপকার করবার জন্য আমার প্রাণটা আকুল হয়ে উঠেছিল? তা তো নয়। মনের অগোচরে পাপ নেই। ওর নামটা দেখেই কেমন যেন মনের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠল। ফটোটা দেখে আর আত্মসংবরণ করতে পারিনি। একদিন চ্যালেঞ্জ করে বলেছিলাম—যুদ্ধ আর প্রেমের অভিধানে 'অন্যায়' বলে শব্দটির স্থান নেই। ও বলেছিল—'মনে থাকবে উপদেশটা'। মনে রেখেছিল সে। কেড়ে নিয়েছিল শেষ পর্যন্ত গৌতমকে। নিজে অবশ্য পায়নি—কিন্তু আমাকেও পেতে দেয়নি। প্রচণ্ড আঘাত পেয়েছিলাম সেদিন। তাই কি আজ ইচ্ছা জেগেছে পার্বত্য-মূষিককে আমার রাজ-দরবারে হাজির করতে?

আজ অবশ্য মনের সে মেঘ সরে গেছে। আজ আমি পুরোপুরি সুখী। কী পাইনি আমি? এর চেয়ে কী বেশী দিতে পারত আমাকে গৌতম? অলকের চরিত্র গৌতমের চেয়ে অনেক বেশী দৃঢ়। ও আমাকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসে। গৌতমের ভালবাসাও ছিল তীব্র; কিন্তু বোধহয় নিখাদ ছিল না। তার প্রেম ছিল ঘড়ির দোলকের মতো। পর্ণা আর সুনন্দার মধ্যে প্রতিনিয়ত দুলতো তার অস্থিরমতি ভালবাসা। আর আমার স্বামীর প্রেম যেন দিগ্‌দর্শন-যন্ত্র। জোর করে অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেও আমারই দিকে ফিরে আসবে তার একমুখী প্রেম।

তবু মাঝে মাঝে মনে হয়, বুঝি মনের কোন একটা কোণা খালি রয়ে গেছে। কি যেন পাওয়া হয়নি। কিসের যেন অভাব। বড় যেন

ছককাটা জীবন আমাদের। গৌতমের সঙ্গে প্রায়ই আমার মতের মিল হত না। আমি যদি উত্তরে যেতে চাই—ওদক্ষিণমুখী রাস্তা ধরত। আমি যদি বলতাম—এস গল্প করি, ও বলত—না, চল বরং সিনেমা যাই। আবার আমি যদি বলি—আজ সিনেমা যাব, ও সঙ্গে সঙ্গে বলে বসত—আজ বরং নদীর ধারে বেড়ানো যাক। মতের এই অমিলের মধ্যে দিয়েই হত আমাদের মিল। ও ইংরেজী ছবি দেখতে পছন্দ করত—আমি ছিলাম বাংলা ছবির পোকা। এই নিয়ে আমাদের লেগে থাকত নিত্য খিটিমিটি। অলকের সঙ্গে ঝগড়া হওয়ার উপায় নেই—ওর কোন ছবি ভালোওলাগে না, খারাপও নয়। অন্তত মতামত প্রকাশ করে না ভুলেও। জিজ্ঞাসা করলে বলে—'তোমার কেমন লেগেছে ?' আমি ভালো-খারাপ যাই বলি, ও বলে—'আমারও তাই।' এক একদিন কেমন যেন গায়েপড়ে ঝগড়া করতে ইচ্ছে হয় ; কিন্তু ও সব তাতেই সায় দিয়ে যায়। দুঃখ করে একদিন বলেই ফেলেছিলাম—'তুমি আমার সব কথায় সায় দিয়ে যাও কেন বল তো ? তোমার নিজস্ব কোনও মত নেই ?'

ও বলল—'কেন থাকবে না, নিজস্ব মতটা এ ক্ষেত্রে তোমার অনুকূলে।'

রাগ করে বলি—'এ ক্ষেত্রে নয়, সব ক্ষেত্রেই।'

ও হেসে বলে—'সেকথা ঠিক।'

—'কিন্তু কেন ?

—'শুনবে ? তবে শোন—'ইফ মেন উড কন্সিডার নট সো মাচ হোয়্যারিন দে ডিফার অ্যাজ হোয়্যারিন দে এগ্রি, দেয়ার উড বি ফার লেস অব আনচ্যারিটেব্‌লনেস অ্যাণ্ড অ্যাংরি ফিলিং ইন দ্য ওয়ার্ল্ড!'

এবার আমাকে বলতে হবে—'বেকন বলেছেন বুঝি ?'

আর ও বলবে—'না এডিসন!'

আচ্ছা এইভাবে একটা মানুষ সারা জীবন কাটাতে পারে ? জীবনে যা কিছু ভালবাসতাম সবই আমি পেয়েছিলাম, কিন্তু ওগো

নিষ্ঠুর ভগবান! এত সহজে, এত অপ্রতিবাদে, এত অনায়াসে আমাকে সব দিলে কেন? কিছু বাধা, কিছু ব্যতিক্রম, কিছুটা ফাঁকিও কেন রাখলে না তুমি? শাড়ি-গহনায় আমার লোভ ছিল এককালে—কিন্তু এমন বাক্সভরতি জিনিস তো আমি চাইনি। আমার দুঃখটা আমি বোঝাতে পারি না। নমিতাও অবাক হয়ে যায়—বলে, বুঝি না কি চাও তুমি সত্যি। কি করে বোঝাব?

এই তো সেদিন আমি, নমিতা আর কুমুদবাবু মার্কেটে গিয়েছিলাম। নমিতার একটা মাইশোর জর্জেট পছন্দ হল, কিনতে চাইল। আপত্তি করলেন কুমুদবাবু। বললেন—'এই তো সেদিন একটা ভাল শাড়ি কিনলে ওমাসে।' নমিতা চুপ করে গেল। আমার বুকের মধ্যে গুড়গুড় করে ওঠে। ও কেন এমন করে আমার ইচ্ছায় বাধা দেয় না! ধমকও ও দেয়, কিন্তু সে আমার ইচ্ছাতে বাধা দিতে নয়—সে অন্য কারণে—কেন আমি রুটিন-বাঁধা পথে চলছি না, তাই। কেন মাসে মাসে নতুন শাড়ি কিনছি না, নতুন গহনা গড়াচ্ছি না, তাই মার্কেট থেকে ফিরবার পথে নমিতা একটি কথাও বলল না—আমার ভীষণ হিংসে হচ্ছিল ওকে। মনে হচ্ছিল—কী সৌভাগ্য নমিতার এ শাড়ির ব্যাপার নিয়ে আজ রাত্রে ওদের মান-অভিমানের পালা চলবে—আর শেষ পর্যন্ত কুমুদবাবুকে হার স্বীকার করতে হবে পরের দিন সেই শাড়িটিই কিনে এনে মান ভাঙাতে হবে নমিতার অতটা না হলেও অন্তত ইংরেজী উদ্ধৃতি শুনতে হবে না নমিতাকে এই অভিমানের জন্যে!

প্রসাধন জিনিসটা আমার চিরকাল ভাল লাগে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেতে আমার এককালে আজকাল আয়নার সামনে দাঁড়ালেই আমার মাথা ধরে। রোজ সন্ধ্যাবেলা সেই তাসের দেশের হরতনের বিবিটি সাজতে সর্বাঙ্গ জ্বালা করে আমার! গোলাপ ফুল জিনিসটা যে এত কদর্য, তা স্বপ্নে ভেবেছিলাম কোনদিন?

সিনেমা দেখাটাও। প্রতি রবিবারের সন্ধ্যাটি বন্দী থাকতে হয় রুদ্ধদ্বার কক্ষে! প্রাণান্তকর বিড়ম্বনা! কোনদিন অসময়ে এসে বলে নি—'দুখানা টিকিট কেটে এনেছি, চটপট তৈরী হয়ে নাও!' অন্তত একথাও কোনদিন বলেনি—'এ রবিবার একটা জরুরী কাজ আছে আমার। এবার থাক লক্ষিটি, সোমবার নিয়ে যাব তোমাকে।'

আমি যা চাই, তাই পাই। কিন্তু বড় হিসেবী সেই পাওয়াটা। বাঁধা পশুকে শিকার করায় আর যাই হোক শিকারের থ্রিল নেই! বাঁধা মাইনেয় নেই সেই শিহরণ যা পাওয়া যায় হঠাৎ-পাওয়া বোনাসে! আমি ভালবাসি মুখ বদলানো হিসাবে। মাঝে মাঝে দাম্পত্য-কলহ হবে, ছোটখাট বিষয় নিয়ে মতবিরোধ ঘটবে, চলবে মান অভিমানের পালা কয়েকটা দিন—তারপর হবে গভীরতর মিলন! কিন্তু যা চাই তা কি চেয়ে পাওয়া যায়? এ কথা কি বলে বোঝানো যায়? ভয় হয় বলতেও; ও যা মানুষ হয়তো বলে বসবে—'বেশ তো, এবার থেকে প্রতি বুধবার সন্ধ্যায় আমি সব বিষয়ে ডিসেগ্রি করব তোমার সঙ্গে!'

আপনারা হয়তো ভাবছেন বাড়াবাড়ি করছি। অলকের মতো বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোক এমন ছেলেমানুষি করতে পারে? পারে। বিশ্বাস না হয় শুনুন। একদিন আপত্তি করেছিলাম রবিবার সন্ধ্যায় সিনেমা যেতে, বললাম—'আজ এসো দুজনে ছাদে গিয়ে গল্প করি।'

ও বলল...'সপ্তাহে একদিন· আমোদ করা উচিত। আমাদের প্রোগ্রাম আছে রবিবারে সিনেমা যাওয়ার।'

বললাম—'বেশ তো নটার শো'তে যাব।

—'ওরে বাবা, রাত বারোটা পর্যন্ত আমি সিনেমা দেখতে পারব না। আর তা ছাড়া তুমি আমার সঙ্গে ঠিক ছটায় যাবে বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেছ!'

'এত রুটিন-বাঁধা দাম্পত্য-জীবন ভালো লাগে তোমার?'

এর উত্তরে ও কি বলল জানেন ? ও বলল 'নাথিং ইন্সপায়ার্স কনফিডেন্স ইন এ বিজনেসম্যান স্নুনার ছ্যান পাংচুয়ালিটি !'—কথাটা ম্যাথুসের !

আপনারা বলতে পারেন এর উত্তরে আমার প্রশ্ন করা উচিত ছিল—'তোমার-আমার সম্পর্কটা বিজনেসের ?'

স্বীকার করছি, সে প্রশ্ন আমি করিনি। কারণ ওর সঙ্গে এতদিন ঘর করে বুঝেছি, এ কথা বললেই শুনতে হবে আর একটা জ্ঞানগর্ভ বাণী—বিবাহও যে একটা বিজনেস—একট কণ্ট্রাক্টমাত্র সে সত্যটা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যেত মুহূর্তে। শেক্সপীয়র, শ' অথবা জেমস জয়েস কে যে ওর পক্ষ থেকে সওয়াল করতেন তা জানি না, তবে এটুকু জানি যে, আমার যুক্তি যেত ভেসে !

তাই তো সেদিন যখন ওর জামা-কাপড় কাচতে দেওয়ার সময় পকেট থেকে দুটো সিনেমা টিকিটের কাউণ্টারপার্ট বের হল তখন অবাক হয়ে গেলাম আমি। আরও অবাক হলাম এই জন্যে যে, টিকিট দুটি রাত্রের শো'র ! গত বৃহস্পতিবার রাত্রের। মনে মনে হিসাব করে দেখি, গত বৃহস্পতিবার রাত্রে নমিতার ননদের বিয়েতে গিয়েছিলাম। রাতে বাড়ি ফিরিনি। ও যায়নি, অফিসের কি জরুরী কাজের জন্যে। টিকিট দুখানা হাতে করে আমি কেমন যেন বিহ্বল হয়ে গেলাম। অলক মুখার্জি রাতের শো'তে সিনেমা দেখেছে ? বৃহস্পতিবার রাত্রে ? যে বৃহস্পতিবার কাজের চাপে সে সামাজিক নিমন্ত্রণ রাখতে যেতে পারেনি সস্ত্রীক ! সমস্ত দিন ছটফট করতে থাকি। কখন ও বাড়ি ফিরবে, কখন ওকে জিজ্ঞাসা করে নিশ্চিন্ত হব। হঠাৎ মনে হল দ্বিতীয় টিকিটটা কার ? ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা সম্ভাবনার কথা মনে হতেই শিউরে উঠলাম। এমন প্রকাশ্যে চমকে উঠলাম যে, মলিনা ঘর মুছতে মুছতে হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলে—'দিদিমণি যে জেগে জেগে দেয়ালা দেখছে গো !'

মলিনা আমার বাপের বাড়ি থেকে এসেছে। অনেকদিনের লোক।

পুরানো খবরের কাগজটা খুলে দেখলাম সেদিন ঐ 'হলে' 'ফল অব বার্লিন' বইটার শেষ শো হয়েছে। ওটা আর এখন কলকাতায় দেখানো হচ্ছে না। আমরা ওটা দেখিনি।

সন্ধ্যাবেলায় ও ফিরতেই প্রশ্নটা করলাম। সোজাসুজি না করে বললাম—'এ রবিবার চল 'ফল অব বার্লিন' দেখে আসি।'

—'বেশ!'

—'বইটা তোমার জানাশোনা কেউ দেখেছে নাকি? কি বলছে লোকে?'

ও নির্বিকারভাবে বলল—'তুমি জান, সিনেমার খোঁজ আমি রাখি না।'

—'ও হ্যাঁ, তাই তো! কিন্তু বইটা তো তুমি নিজেই দেখেছ?'

—'আমি? কি বই?'

আমি টিকিটের ভগ্নাংশদুটি ওর সামনে মেলে ধরে বলি, 'এই বই!'

—'ও সেই সিনেমাটা? সেই হিটলারের মতো দেখতে একটা জোকার আছে যেটাতে? হ্যাঁ ভালোই লেগেছে বইটা। চল না রবিবারে যাওয়া যাবে—'

—'কিন্তু তুমি তো দেখেছ সিনেমাটা!'

—'তাতে কি হয়েছে—না হয় আবার দেখব।'

—'তা তো বুঝলাম—কিন্তু এই জরুরী কাজেই বুঝি সেদিন রত্নার বিয়েতে যেতে পারলে না?'

হো হো করে হেসে ওঠে অলক। বলে—'কথাটা তোমায় বলতে ভুলেই গেছি। সত্যিই জরুরী কাজ ছিল সেদিন। রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজের মধ্যে ডুবে ছিলাম আমরা। তারপর আর কাজ ছিল না। এক বন্ধু জোর করে ধরে নিয়ে গেল সিনেমায়। ঐটাই নাকি লাস্ট শো ছিল। তেমন করে ধরলে কি করি বল?'

—'ও! তেমন করে ধরলে বুঝি নাইট শো'তেও সিনেমা দেখা যায়? তা এমন করে কোন বন্ধুটি তোমায় ধরল শুনি?'

'—সে তুমি চিনবে না। আমার একজন পোলিশ বন্ধু। আমার সঙ্গে একসঙ্গে পড়তো গ্লাসগোতে। হঠাৎ দেখা হয়ে গেল পথে। ভারতবর্ষ দেখতে এসেছে। বলল—মুখার্জি, যুদ্ধটা আমরা কেমন উপভোগ করেছি চল দেখিয়ে আনি তোমায়। নিকলস্-এর সঙ্গে আলাপ হলে বুঝতে ওর কথা ঠেলা যায় না। সাড়ে ছ ফুট লম্বা ইয়া-জোয়ান, শিশুর মতো সরল এদিকে।'

বুক থেকে পাষাণভার নেমে যায়। নিজেকেই ধমক দিই—ছি ছি, কী ছোট মন আমার! কেমন করে আমি ভাবতে পারলাম ও কথা? অলকের মন শ্লেটের তৈরী নয় যে, অত সহজেই আঁচড় পড়বে। সে মন শক্ত গ্রানাইটের তৈরী, সাধ্য কি পর্ণার যে সেই পাথরের উপর দাগ কাটে?

॥ তিন ॥

এ কাজ কেন করলুম? আমার মনে তো কোন পাপ ছিল না। তাহ'লে সমস্ত কথা অকপটে স্বীকার করলুম না কেন? নিজেই নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছি। মিথ্যা জিনিসটা খারাপ, সত্য গোপন করাও অন্যায়, কিন্তু সত্য মিথ্যা মিশিয়ে বলার মতো পাপ বোধকরি আর নেই। আমি সত্যের পোষাকে মিথ্যাকে সাজিয়েছি। যদি খোলাখুলি বলতে পারতুম—হ্যাঁ, মিস্ রয়কে সঙ্গে করেই আমি রাত্রের শো'তে সিনেমা দেখতে গিয়েছিলুম, তা হলেই সত্য রক্ষা হত। ধর্মপত্নীকে অকপটে সত্য কথা বলাই আমার উচিত ছিল—কারণ আমার মন ছিল নিষ্কলুষ। হোরেস মান এক জায়গায় ভারি সুন্দর একটি কথা বলেছেন—'ইউ নিড নট টেল অল দ্য ট্রুথ আনলেস টু দোজ হু হ্যাভ এ রাইট টু নো ইট অল। বাট লেট অল ইউ টেল

বি ট থ।' অর্থাৎ সমস্ত সত্যি কথাটা তাদেরই খুলে বলবে যাদের গোটা সত্যটা জানবার অধিকার আছে। তবু যেটুকু বলবে তা সত্যি করেই বল। আমার বিষয়ে সবকথা জানবার অধিকার আছে নন্দার। সে আমার জীবন-সঙ্গিনী। সুতরাং কী অবস্থায় সে রাত্রে পর্ণাকে নিয়ে সিনেমা যেতে বাধ্য হয়েছিলাম, সে কথা খুলে বলা উচিত ছিল আমার। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তটিতে কেমন যেন সব গুলিয়ে গেল। এমন পি. সি. সরকারী ঢঙে চট করে টিকিট দুটো আমার নাকের উপর মেলে ধরল নন্দা যে, আমি নার্ভাস হয়ে প'ড়লুম। তাড়াতাড়ি সাড়ে ছয়ফুট লম্বা আমার কাল্পনিক বন্ধু নিকলসের আড়ালে আত্মগোপন করে বসলুম। নাঃ! কাজটা ভালো করিনি।

অথচ ঈশ্বর জানেন, আমার মনে কোন পাপ ছিল না।

কিছুদিন থেকেই লক্ষ্য করছি, আমাদের কারখানায় যেন কোন অদৃশ্য ধূমকেতুর করাল ছায়াপাত ঘটেছে। শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা আমাদের নিষ্কলুষ। মিলেমিশে কাজ করছি আমরা বাবার আমল থেকে। কোনদিন ওরা বিদ্রোহ করেনি—ধর্মঘট হয়নি। এমন কি আজও পর্যন্ত শ্রমিক ইউনিয়ন গড়ে ওঠেনি এ কারখানায়। ওরাদিব্যি যন্ত্রের মতো কাজ করে যায়, টিকিট পাঞ্চ করায়, সপ্তাহান্তে প্রাপ্য নিয়ে ফিরে যায় বস্তীতে। বিড়ি ফোঁকে, তাড়ি খায়, বউ ঠ্যাঙায়, আর মন দিয়ে কাজ করে কারখানায় এসে। হঠাৎ এ তাদের দেশে এসে পৌচেছে কোন সাগর পারের ঢেউ। চঞ্চল হয়ে উঠেছে মানুষগুলো। স্পষ্ট কিছু দেখতে পাই না—কিন্তু অনুভব করি, ভিতরে ভিতরে কি যেন একটা পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে। বড় পুকুরে বেড়া জাল পড়লে মাছেরা তা দেখতে পায় না, কিন্তু যখন জাল ক্রমশ গুটানো হয় তখন তারা কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করে, জল যেন ভারি ভারি লাগে। আমারও অবস্থাটা হয়েছে ঐ রকম। শ্রমিকদের মুখে কেমন একটা উদ্ধত বিদ্রোহের ছায়া লক্ষ্য করছিলাম কদিন ধরে। কে তার ইন্ধন জোগাচ্ছে তা টের

পাই না—কিন্তু পরিবর্তন একটা যে হয়েছে তা অনুভব করতে পারি। সেই ধূমায়িত বিদ্বেষবহ্নি হঠাৎ একদিন প্রকাশ্য রূপ নিল একজন ফোরম্যানের অবিমৃষ্যকারিতায়। নিঃসংশয়ে ফোরম্যান সেনগুপ্তই দোষী; কিন্তু ফ্যাক্টারির অলিখিত আইন অনুযায়ী শাস্তি দিতে হল শ্রমিকটিকেই। একজন সামান্য মেহনতি মানুষ যদি ফোরম্যানের গায়ে হাত তোলে তবে শাস্তি না দিয়ে কি করি? এ না করলে ডিসিপ্লিন থাকে না। সেনগুপ্তকেও কঠিন ভাষায় ধমকে দিলুম। ফের যদি কুলি বস্তীতে গিয়ে মেয়েছেলেদের দিকে নজর দেয় তাহলে তাকে বরখাস্ত করতে বাধ্য হব আমি।

কিন্তু আশ্চর্য! পাথরে-কোঁদা কালো কালো মানুষগুলো আমার বিচারে সন্তুষ্ট হল না। ওরা দল পাকালো। জোট বেঁধে আমাকে এসে জানালো, আমার বিচার তারা মেনে নিতে রাজী নয়। নন্দ মিস্ত্রির জরিমানা মাপ করতে হবে এবং সেনগুপ্তকে তাড়াতে হবে। আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। এ যে নতুন কথা! শ্রমিকেরা দাবির একটা লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করল। সে আবেদন-পত্রের ভাষা দেখেই পারি বুঝতে ভিতরে লোক আছে। অফিসের কর্তা-ব্যক্তিরা পরামর্শ দিলেন—দৃঢ় হাতে বিদ্রোহ দমন করতে হবে। আমি কিন্তু জানতুম, বাধা দিতে গেলেই সংঘাতটা বিরাট আকার ধারণ করবে। অঙ্কুরেই একে বিনাশ করা চাই। বাধা দিয়ে নয়, দরদ দেখিয়ে। 'উইথ কাইণ্ডনেস হি ইজ টু বিস্লেন!' কারখানায় আমার কয়েকজন ইনফর্মার ছিল—যেমন সব কারখানাতেই থাকে। তারা খবর আনল যে, একজন শ্রমিক-নেতাকে ওরা কোথা থেকে ধরে এনেছে অবশ্যম্ভাবী ধর্মঘট পরিচালনার জন্য। একখণ্ড ছাপানো কাগজও এনে দিলে তারা। সাপ্তাহিক পত্রিকার একটা সংখ্যা। নাম 'দেওয়ালের লিখন'। এ কাগজের নামই জানতুম না। তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে আমার কারখানার ব্যাপারটা ফলাও করে ছাপা হয়েছে। ফোরম্যান সেনগুপ্তের ঘটনাটা আনুপূর্বিক বর্ণনা করে সম্পাদক আমায় বাপান্ত

করেছেন ! স্থির করলুম, আর অগ্রসর হতে দেওয়া নয়। শ্রমিকদলের তিনজনের ডেপুটেশনের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে রাজী হয়ে গেলুম।

'তিনজন শ্রমিক প্রতিনিধি যেদিন আমার সঙ্গে দেখা করতে এল সেদিন লক্ষ্য করে দেখি, ওদের ভিতর একজন আমার অচেনা। তার পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই অন্য একজন বললে—উনি স্যার একজন শ্রমিক-নেতা, আমাদের তরফ থেকে উনিই কথাবার্তা চালাবেন।

আমি বলি—কিন্তু এ কথা তো ছিল না ! শ্রমিক-মালিকে বোঝা-পড়ার মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির তো থাকার কথা নয়।

ভদ্রলোক বলেন—এটাই কিন্তু প্রচলিত রীতি মিস্টার মুখার্জি। এরা শ্রমিক আইনের খুঁটিনাটি জানে না, কিসে তাদের ভালো হবে তাও সব সময় বোঝে না। আপনার তরফে কোন আইনের প্রশ্ন উঠলে আপনি সলিসিটারকে জিজ্ঞাসা করতে ছুটবেন—ওদের তরফেও কেউ উপদেষ্টা থাকলে আপনার আপত্তি কেন ?

বললুম—বেশ, ওরা যদি চায় তবে আপনিও থাকুন। কিন্তু একটা কথা। আলোচনার আগেই আমি ওদের দুজনের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেতে চাই যে, আপনি ওদের হয়ে যে-সব কথা দেবেন তা মানতে ওরা বাধ্য থাকবে।

বাকি দুজন সমস্বরে বলে ওঠে—নিশ্চয়ই. নিশ্চয়ই।

তারপরই আলোচনা শুরু হয়ে যায়।

দেখলুম ভদ্রলোক তীক্ষ্ণধী। কথা বলতে জানেন। শুনতেও। সমস্ত সমস্যাটা সহজ কথায় গুছিয়ে উপস্থাপিত করলেন। সমাধানের ইঙ্গিতও দিলেন স্পষ্ট ভাষায়।

একটু পরে আমি বলি—আলোচনায় যেসব সিদ্ধান্ত হচ্ছে, আমার মনে হয়. সেগুলি এখনই লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত। আপনি কি বলেন মিস্টার—

—ব্যানার্জি। সে তো ঠিক কথাই।

—তাহলে আমার স্টেনোকে ডাকি ?

—ডাকুন।

বিজলী বোতাম টিপতেই বেয়ারা এসে দাঁড়ালো। তাকে পাঁচ প্লেট খাবার আর কফি আনতে বলি—আর ডেকে দিতে বললাম স্টেনোকে। অল্প পরেই মিস্ রয়ের আবির্ভাব ঘটল দ্বারপথে।

ডিক্‌টেশনের খাতা-পেন্সিল হাতেই সে এসেছে—কিন্তু নিজের আসনে এসে বসল না। স্থইং ডোরের এপারে সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। একদৃষ্টে সে তাকিয়ে আছে শ্রমিকনেতা মিস্টার ব্যানার্জির দিকে।

লক্ষ্য করলাম, মিস্টার ব্যানার্জি এতক্ষণ তাকে দেখতে পাননি। চোখ তুলে ওর দিকে তাকিয়েই ভদ্রলোক চমকে ওঠেন। অজান্তে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান। অস্ফুটে তাঁর অধরোষ্ঠ থেকে বের হয়ে আসে একটি মাত্র শব্দ—পর্ণা।

মুহূর্ত মধ্যে দুজনেই আত্মসংবরণ করে। পর্ণা এগিয়ে এসে বসে তার নির্দিষ্ট আসনে। নতনেত্রে খাতা খুলে পেন্সিল হাতে প্রতীক্ষা করে। যেন কিছুই লক্ষ্য করিনি আমি, এইভাবে ঘূর্ণ্যমান বিজলী পাখাটার দিকে তাকিয়ে বলে গেলুম—'দ ফলোয়িং ডিসিশন্‌স্ ওয়্যার মিউচুয়ালি এগ্রিড আপন ইন এ জয়েণ্ট ডিস্‌কাশন হেল্ড ইন দি চেম্বার অব···'

লক্ষ্য করলুম, দীর্ঘ দেড়ঘণ্টার কনফারেন্সে দুজনের মধ্যে আর দৃষ্টি বিনিময় হয়নি। মিটিং শেষ হল। বেয়ারাকে ডেকে বলি—এঁদের পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে বসাও।

শ্রমিক নেতা ব্যানার্জিকে বলি—আপনারা ও ঘরে একটু অপেক্ষা করুন। এটা টাইপ হয়ে গেলে সই করে এক কপি দিয়ে যাবেন, আর এককপি নিয়ে যাবেন।

নমস্কার বিনিময়ের পালা সাঙ্গ হলে ওরা চলে গেল।

পর্ণাও আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, বলে—ক' কপি ছেপে আনব?

—সে কথার জবাব না দিয়ে বলি—আপনি মিস্টার ব্যানার্জিকে চিনতেন?

একটু ইতস্তত করে পর্ণা স্বীকার করে।

—কি সূত্রে ওর সঙ্গে আলাপ?

—আমরা একই কলেজে পড়তাম।

—আই সী! তাহলে বন্ধু বলুন!

পর্ণা হেসে বলে—হ্যাঁ; খুবই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলাম এককালে।

—তারপর দীর্ঘদিন অসাক্ষাতে সে বন্ধুত্বের উপর মরচে পড়েছে, কেমন?

পর্ণা হাসল। জবাব দিল না। আগের প্রশ্নটাই করল আবার—কয় কপি ছেপে আনব স্যার?

আমার মাথায় তখন অন্য চিন্তা খেলছে। পর্ণা বলেছে, এককালে ওরা খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল। সুনন্দা বলেছে, ওর সঙ্গে কলেজে একটি ছেলের খুব মাখামাখি হয়েছিল। এই কি সেই? একটা বুদ্ধি খেলে গেল মাথায়। বলি—বসুন।

পর্ণা আবার বসে পড়ে তার আসনে। আমার চেয়ার থেকে অদূরে। আমি জানালার বাইরে তাকাই। বর্ষার আকাশে মেঘ করেছে, এলো মেলো বাতাস বইছে। এখনই হয়তো বৃষ্টি নামবে। আমার কিন্তু তখন সেদিকে নজর নেই—আমি শুধু ভাবছিলুম, এই মেয়েটিকে কাজে লাগানো যায় না? মাতাহরিকে আমি দেখিনি, কিন্তু তারও নিশ্চয় ছিল এমন ঈগলদৃষ্টি-দগ্ধকারী চাহনি। দেখাই যাক না। বললুম—'দি লস অব এ ফ্রেণ্ড ইজ লাইক দ্যাট অব এ লিম্ব; টাইম মে হীল দি অ্যাঙ্গুইশ অব দি উণ্ড, বাট দি লস্ ক্যানট বি রিপেয়ার্ড!'—কে বলেছেন বলতে পারেন?

দাঁত দিয়ে পেন্সিল কামড়াতে কামড়াতে ও বলে—পারি! সাউদে!

চমকে উঠি! একবারে এমন নির্ভুল উত্তর কখনও শুনিনি। সুনন্দা এতদিনেও একটি নির্ভুল উত্তর দিতে পারেনি। বরং প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়। মনে মনে মেয়েটির উপর খুশী হয়ে উঠি। সে

ভাব গোপন করে বলি—তাহলে বন্ধুটিকে এভাবে হারিয়ে যেতে দিচ্ছেন কেন ?

মিস রয় মিটিমিটি হেসে বলে—তা হ'লে আমিও একটা প্রশ্ন করব স্যার ? বলুন এটা কার কথা—'ইফ এ ম্যান ডাজ নট মেক নিউ ফ্রেণ্ডস্ এ্যাজ হি পাসেস থ্রু লাইফ, হি উইল সুন ফাইণ্ড হিমসেল্ফ লেফ্ট অ্যালোন।'

উৎসাহের আতিশয্যে পেন্সিল সমেত পর্ণার ডান হাতখানা চেপে ধরে বলি—সপ্লেণ্ডিড ! ডক্টর জনসন !

পরমুহূর্তেই হাতটি ছেড়ে দিয়ে বলি—আয়াম সরি !

পর্ণা একটু লাল হয়ে ওঠে। তৎক্ষণাৎ সামলে নিয়ে বলে—না, না, দুঃখিত হবার কি আছে ?

আমি গম্ভীর হয়ে বলি—আছে, মিস্ রয়। উৎসাহের আতিশয্যে আমি কাণ্ডজ্ঞান হারিয়েছিলুম। ব্যাপারটা কি জানেন ? কোটেশান-খেলা আমার একটা হবি। এমন একটা অ্যাপ্ট কোটেশন পেলে আমি একবেলা না খেয়ে থাকতেও রাজী আছি। কিন্তু তাহলেও, আই মাস্ট এ্যাডমিট, এতটা আপসেট হওয়া উচিত হয় নি আমার।

পর্ণা ধীরে ধীরে বলে—আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা প্রভু ভৃত্যের—কিন্তু একটা জায়গায় দেখছি আমাদের অদ্ভুত মিল আছে। সময়োপযোগী কোটেশান পেলে আমিও অনেক কিছু না পাওয়ার দুঃখ ভুলে থাকতে পারি। সুতরাং সামাজিক ব্যবধান সত্ত্বেও—

আমি বাধা দিয়ে বলি—বার বার ও কথা কেন ? আপনি: বলতে চাইছেন কমন হবির সূত্র ধরে উই মে বি ফ্রেণ্ডস্।

পর্ণা বলে—অবশ্য আপনার তরফে বাধা থাকতে পারে।

—কি বাধা ?

—প্রাচ্যের একজন পণ্ডিত বলেছেন, 'নেভার কনট্রাক্ট ফ্রেণ্ডশিপ উইথ ওয়ান ছাট ইজ্ নট বেটার ছান দাই-সেল্ফ।'

এবার আর কোন সংকোচ না করে ওর হাতখানি ধরে আমি বলেছিলুম—কনফ্যুশিয়াস্।

পর্ণার হয়তো ধারণা তার উদ্ধৃতি-পটুতায় খুশী হয়ে আমি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়েছি। সুনন্দা শুনলে নিশ্চয়ই একটা মারাত্মক কদর্থ করত। কিন্তু আমার উদ্দেশ্যে ছিল আরও গভীর। নন্দাকে প্রশ্ন করে জেনেছি, কলেজ জীবনে যে-ছেলেটির সঙ্গে পর্ণার মাখামাখি হয়েছিল তার নাম গৌতম ব্যানার্জি। অতএব পর্ণাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করলে গৌতমবাবু যে সহজেই কাত হয়ে পড়বেন এটা অনুমান করতে পারি। ভয় ছিল, পর্ণা যদি রাজী না হয়। খুব কৌশলে ঘুরিয়ে প্রস্তাবটা উত্থাপন করলুম পর্ণার কাছে। অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মেয়ে। বুঝে নিল আমার মতলব। রাজী হয়ে গেল এক কথায়। আমিও নির্বোধ নই, শুধুমাত্র বন্ধুত্বের দাবিতেই এ কাজ করতে সে রাজী হয়নি। সে জানে, আমাকে খুশী করতে পারলেই তার উন্নতি। মসীজীবী একটি অনূঢ়া মেয়ের পক্ষে এটাই তো স্বাভাবিক। চাকরির উন্নতিতেই ওদের চতুর্বর্গ! কয়েকদিনের ভিতরেই সে শ্রমিক-নেতা ব্যানার্জির সঙ্গে পুরাতন বন্ধুত্ব ঝালিয়ে নিল। শ্রমিক নেতার গতিবিধি, ও পক্ষের যাবতীয় সংবাদ সে আমাকে গোপনে সরবরাহ করে। সাতদিনের ভিতরেই সে এমন কয়েকটি গোপন খবর আমাকে এনে দিল যে আমি স্তম্ভিত। সেদিন একখণ্ড লম্বা কাগজ এনে আমার হাতে দিয়ে বলে—দেখুন স্যার।

—কি এটা ?

—গ্যালি প্রুফ। আগামী সপ্তাহে এটা ছাপা হবে 'দেওয়ালের লিখনে।'

আমাকে ন্যাকা সাজতে হয়—'দেওয়ালের লিখন' আবার কি ?

—শ্রমিক নেতা ব্যানার্জির সাপ্তাহিক।

—উনিই সম্পাদক ?

—হুঁ।

—আপনি এ লেখা কোথায় পেলেন ?

—কেন ? ওর কাগজের অফিসে।

আশ্চর্য ধূর্ত মেয়ে। কী কৌশলে হস্তগত করেছে কাগজখানা। ভারি সুবিধা হল সেখানা পেয়ে। তাড়াতাড়ি শুধরে নিলুম ক্রুটি। এমন কি পরের সপ্তাহে লেখাটি বারই হল না ওই পত্রিকায়। তার আগেই আমরা সামলে নিয়েছি।

স্থির করলুম, ওকে তৎক্ষণাৎ পুরস্কৃত করতে হবে। তাকে ডেকে বলি—এই অফিস অর্ডারটা টাইপ করে দিন।

পর্ণা অর্ডারটা পড়ছিল। তার কর্মদক্ষতায় খুশী হয়ে কর্তৃপক্ষ তার বেতন আরও পঞ্চাশটাকা বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন। ভেবেছিলুম, ও খুশী হয়ে উঠবে। কিন্তু সে রকম কোন লক্ষণই লক্ষ্য করি না। আদ্যন্ত পাঠ করে সে আমাকে কাগজখানা ফিরিয়ে দিল। বললে—এটা আপনি করবেন না স্যার।

—কেন ?

—এটা করলেই গৌতম সতর্ক হয়ে যাবে। ওর ধারণা, আপনি আমার উপর খুশী নন। তাই বিশ্বাস করে অনেক কথা সে আমাকে বলে। ধর্মঘট ভেঙ্গে যাবার পর কার কার বেতন বৃদ্ধি হল, সে খবরটা কি ওরা পাবে না ভেবেছেন ?

ওর বুদ্ধিতে চমৎকৃত হয়ে গেলুম। এতটা দূরদৃষ্টি ওর থাকতে পারে তা ভাবতেই পারিনি। সুনন্দা হলে নিশ্চয় খুশীর পাখনা মেলত। তাই বললুম—কিন্তু আপনি আমাদের এত উপকার করলেন, আমরা কি কিছুই প্রতিদান দিতে পারব না ?

—আপনাদের উপকার করবার জন্য তো আমি এ কাজ করছি না—

—তবে সংবাদগুলি সংগ্রহ করে আনছেন কেন ?

—আপনি চাইছেন বলে।

—বন্ধুকৃত্য ?

—বন্ধু বলে আর স্বীকার করে নিলেন কই ?

—নিইনি ?

—কই নিয়েছেন ? আজও আপনি আমাকে 'আপনি' বলে কথা বলেন।

হেসে বলি—বেশ, এবার থেকে আর তোমাকে 'আপনি' বলব না পর্ণা। কিন্তু তাহলে তোমাকেও যে 'তুমি' বলতে হয়।

পর্ণা মূহূর্তকাল কি ভাবল, তারপর বলে—সে হয় না। আপনি অফিস-বস। আপনাকে সবার সামনে 'তুমি' বললে অন্য সবাই কি ভাববে ?

আমি নিম্নস্বরে বলি—বেশ, সবার সামনে না হয় নাই বললে। আড়ালে অন্তত বল।

হঠাৎ কি জানি কেন পর্ণা ভীষণ লজ্জা পেল। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায় আসন ছেড়ে। বলে—আমি যাই।

কালো মেয়েও যে ব্লাশ করে এই প্রথম দেখলুম। আমি চট করে ওর হাতটা ধরে বলি—কই, 'তুমি' বলবে কিনা বলে গেলে না ?

পর্ণা এবার এক ঝটকায় হাতটা ছাড়িয়ে নিল। দ্রুতচ্ছন্দে আঁচল সামলে ঘর থেকে চলে গেল। দ্বারের কাছে একবার থমকে দাঁড়ায়, সুইং ডোরের ওদিকে মুখ বাড়িয়ে কি দেখে আমার দিকে ফিরে যাবার সময় বলে গেল—বলব গো, বলব !

পর্ণা চলে গেল। আমি চুপ করে বসে রইলুম। মনের মধ্যে কেমন যেন তোলপাড় করে ওঠে। কাজটা কি অন্যায় হচ্ছে ? আমি কি মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছি ? অফিসের মালিক ও কর্মীর মধ্যে যে সম্পর্ক থাকার কথা, আমি কি তার সীমা লঙ্ঘন করে যাচ্ছি ? আমার অন্তরে কি পর্ণা সত্যিই কোন আলোড়ন তুলেছে ? অসম্ভব। আমার মনে কোন কুচিন্তা নেই। নন্দা আমার মনপ্রাণ ভরে রেখেছে। সেখানে অপর কারও প্রবেশাধিকার নেই। পর্ণা যদি পুরুষমানুষ হত, তাহলে তার সঙ্গে এই বন্ধুত্বে তো কোন আপত্তির কথা উঠত

না। ওকে আমি শুধু অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করছি। ওর সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে বয়ে গেছে আমার। কিন্তু সে যা হোক, আমাকে সতর্ক থাকতে হবে। পর্ণা না শেষ পর্যন্ত আমাকে ভুল বোঝে। আমার নিজের দিক থেকে অবশ্য আশঙ্কার কোন কারণ নেই। কিন্তু পর্ণা তো এর অন্য অর্থ করে বসতে পারে? সুতরাং সাবধানের মার নেই।

যা আশা করেছিলুম তা হল না। বিদ্রোহের আগুন সাময়িকভাবে চাপা পড়েছিল। শ্রমিক-ঐক্য সম্বন্ধে যথেষ্ট আস্থা না থাকায় ও পক্ষ সাময়িক সন্ধি করেছিল মাত্র। খবর পেলুম, ওরা আবার গোপন পরামর্শ শুরু করেছে।

প্রতি বছর বিশ্বকর্মা পূজার দিন আমাদের কারখানায় একটা বার্ষিক উৎসব হয়। অফিসারেরা বড় রকম চাঁদা দেয়, কোম্পানিও কিছু দেয়। প্রাঙ্গণে মেরাপ বেঁধে কর্মীরা অভিনয় করে। বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসেন, প্রেস-রিপোর্টাররা আসেন। এ বছরও সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ। নিমন্ত্রণপত্র পর্যন্ত বিলি হয়ে গেছে। ওরা বোধহয় এই সুযোগের অপেক্ষাতেই ছিল। মনে হয় বিশ্বকর্মা পূজার আগেই ওরা ধর্মঘট ঘোষণা করে আমাদের অপদস্থ করতে চায়! সংবাদটা গোপনে পেলুম। পর্ণাকে সংবাদ সংগ্রহের কাজে লাগালুম; কিন্তু সে এ বিষয়ে কোন খবর আনতে পারলে না। তার ধারণা, ওরা তাকে আর বিশ্বাস করছে না। তার বেতনবৃদ্ধির যে একটা প্রস্তাব হয়েছিল,—এ খবর নাকি ও পক্ষ জানতে পেরেছে।

এরকম অবস্থায় সচরাচর যা হয়—আমার কাজকর্ম হঠাৎ খুব বেড়ে গেল। অফিসের পয়েও অনেক চিঠিপত্র লিখতে হয়। পর্ণাকে আটকে রাখতে বাধ্য হই। দেওয়ালেরও কান আছে। এ অবস্থায় আর কাউকে বিশ্বাস করতে সাহস হয় না। বিশ্বস্ত দুই-একজন কর্মচারীও থাকে। আর থাকে পর্ণা। একের পর এক ডিক্টেশন দিয়ে যাই। বাড়ি ফিরতে কোনদিন দশটা কোনদিন এগারোটা বেজে যায়।

গত বৃহস্পতিবারের কথা। সমস্তদিন ছোটাছুটি করে অফিসে

এসে যখন পৌঁছালুম তখন পাঁচটা বেজে গেছে। অফিসের ছুটি হয়ে গেছে। কর্মচারীরা কেউ নেই—ঝাড়ুদার ঘরগুলি ঝাঁট দিচ্ছে আর দারোয়ান দোবেজী এক গোছা চাবি হাতে নাকে পাগড়ির একপ্রান্ত চেপে ধরে অপেক্ষা করছে। পর্ণার সঙ্গে লিফ্‌টের মুখেই দেখা হয়ে গেল। ও বাড়ি যাচ্ছিল। ওকে বললুম—একবার অফিসে যেতে হবে। খানকয়েক জরুরী চিঠি আছে।

পর্ণা মণিবন্ধের ঘড়ির দিকে এক নজর দেখে নিয়ে বলে—কাল ফার্স্ট আওয়ারে করে দেব।

—না, না, কাল দশটার মধ্যে সে চিঠি বিলি হওয়া চাই। চল চল।

পর্ণা বলে—আজ আমারও একটা জরুরী এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট আছে স্যার। আজ ছেড়ে দিন।

আমি কণ্ঠস্বর নিচু করে বলি—ছেড়ে দিন কেন? বল, 'ছেড়ে দাও'; কিন্তু ছেড়ে দিতেই যদি বলবে তবে ধরা দিলে কেন?

পর্ণা ভ্রূকুঞ্চিত করে বলে—হাশ্‌! দ্য লিফ্‌টম্যান!

তারপর বিনা বাক্যব্যয়ে আমার সঙ্গে লিফ্‌ট-এ উঠে পড়ে।

লিফ্‌টম্যান লোকটা বিহারী, সম্ভবত সে আমাদের কথোপকথনের অর্থ বোঝেনি। তবু মনে হল, এতটা অসতর্ক হওয়া আমার উচিত হয়নি।

লিফ্‌টটি আকারে খুবই ছোট। পর্ণার এলো খোঁপাটি আমার টাইয়ের গায়ে লাগছে। ও কি ক্যান্থারাইডিন মাখে? মাথাটা আমার নাকের খুব কাছে। গন্ধ পাচ্ছি একটা। সেটা প্রসাধনের, না— ব্রাউনিঙের একটা লাইন মনে আসছিল—কিন্তু তার আগেই লিফ্‌টটা এসে থামল নির্দিষ্ট স্থানে। নামতে হল।

পর্ণাকে ডিক্‌টেশন দিলুম। অনেকগুলি চিঠি ও রিপোর্ট। কাজ শেষ করতে রাত আটটা বাজল। লিফ্‌ট তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জনবিরল ডালহৌসী স্কোয়ার। পর্ণা তার কাগজপত্র গুছিয়ে উঠে

পড়ল। আমরা সিঁড়ি দিয়ে পাশাপাশি নেমে আসি। বাইরে টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। বললুম—চল, তোমাকে আমার গাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি। কোথায় তোমার একটা এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল না?

ও বলে—এ্যাপয়েন্টমেণ্ট ছিল সন্ধ্যা ছ'টায়, এখন আর কি হবে?

বললুম—আমি দুঃখিত। এতে তোমার কোন ক্ষতি হল না তো? আশা করি কাল আবার এ্যাপয়েন্টমেণ্টটা হতে পারবে?

—না, কাল আর হবার উপায় নেই। কাল সে এখানে থাকবে না।

—এখানে থাকবে না? কোথায় যাবে?

—বিলেতে।

আমি সত্যিই দুঃখিত হলুম। বলি—এ কথা আগে বলনি কেন পর্ণা?

ও হো হো করে হেসে ওঠে,—বলে, অত রোমান্টিক কিছু নয়। কাল বিলেতে ফিরে যাবে 'ফল-অব-বার্লিন' ছবিটা।—বলে একখণ্ড সিনেমার টিকিট সে ছিঁড়ে ফেলে দিল।

শুনলাম, আজ ক'লকাতায় এই ছবিটির নাকি শেষ শো হচ্ছে। এর টিকিট যোগাড় করা নাকি অত্যন্ত দুরূহ। পর্ণা অনেক পরিশ্রমে আজ সন্ধ্যার শো'র একখানি প্রবেশপত্র কিনেছিল। আমার জন্য এইমাত্র সেই টিকিটখানি ও ছিঁড়ে ফেলে দিল।

বলি—বেশ তো রাতের শো তো আছে।

ও বলে—শো আছে, টিকিট নেই।

গাড়ি তখন চৌরঙ্গীতে পড়েছে। ডাইনে বাঁক ঘুরতেই ও বলে—এদিকে কোথায়? আমি থাকি মানিকতলায়।

উত্তর না দিয়ে লাইট হাউসের সামনে গাড়িটা পার্ক করি। রাত তখন সাড়ে আটটা। সন্ধ্যার শো তখনও ভাঙেনি। রাত্রের শো-তেও হাউস-ফুল। কিন্তু 'রেডি মানি ইজ্ আলাদীনস ল্যাম্প।' অল্প সন্ধান নিয়েই ফিরে এসে পর্ণাকে বলি একখানা টিকিট যোগাড় হয়েছে।

ও বলে—না থাক, রাতের শো'তে একা একা সিনেমা দেখতে সাহস হয় না আমার। বিশেষত এ পাড়ায়। মানিকতলা পৌঁছাতে রাত একটা বাজবে। অত রাতে একা ট্যাক্সিতে—না থাক।

কি করব ভাবছি।

শো'-কেশে লাগানো ছবিগুলি পর্ণা দু-চোখ দিয়ে গিলছে। দুধের স্বাদ বেচারি ঘোলে মেটাচ্ছে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমি নিজে সিনেমা দেখতে ভালবাসি না। শুধু স্ত্রীকে সঙ্গদান করতে রবিবারের সন্ধ্যাটা কোন অন্ধকার ঘরে কাটিয়ে আসি। কিন্তু এই মেয়েটি তার স্বল্প-মাহিনার ভিতর থেকে কয়েকটি মুদ্রা কোনক্রমে বাঁচিয়ে এই প্রবেশপত্রটি সংগ্রহ করেছিল। আমি তার সেই সান্ধ্য-আনন্দটুকু দস্যুর মত কেড়ে নিয়েছি—নিজের স্বার্থে। মেয়েটি আমার অশেষ উপকার করে গেছে দিনের পর দিন—অথচ প্রতিদানে আমি তাকে কি দিয়েছি? প্রতারণা ছাড়া?

পর্ণা বলে—এবার যাওয়া যাক, বৃষ্টিটাও থেমেছে।

বলি—একটু দাঁড়াও, আমি আসছি।

অল্প পরে উচ্চতম মূল্যের দু-খানি কালোবাজারি টিকিট কিনে ফিরে এলুম। একখানি তার হাতে দিতেই বললে—একি! বললাম যে, একা একা রাতের শো'তে সিনেমা দেখি না আমি।

—রোজ রোজ একা দেখ, আজ না হয় দোকাই দেখলে।

দ্বিতীয় টিকিটখানি ওকে দেখালুম।

—কিন্তু, কিন্তু মিসেস মুখার্জি হয়তো ব্যস্ত হয়ে পড়বেন আপনার দেরি দেখে।

—পড়বেন না। কারণ মিসেস মুখার্জি আজ বাড়ি নেই। আর 'আপনার' নয়, 'তোমার'।

—ও, তাই বুঝি আজ পাখা গজিয়েছে?

দুজনেই হেসে উঠি। রাত্রের শো, শুরু হতে তখনও অনেকটা দেরি আছে। তাই দুজনে চৌরঙ্গীর একটা বারে ঢুকলুম। শেরি

খেতেও আপত্তি ওর। অগত্যা ওর জন্যে খাবার অর্ডার দিতে হল। মাঝের 'হলে' বসতে সাহস হল না। কি জানি পরিচিত যদি কেউ দেখে ফেলে। একটি ছোট কেবিনের নির্জনতায় আত্মগোপন করি।

পর্ণা বলে—আমার কিন্তু ভয় করছে।

—কেন ?—এক পাত্র খেয়েই যদি মাতলামি শুরু করি ?

—তা নয়। যদি আমাদের কেউ দেখে ফেলে ? আমাদের সম্পর্কটা বাইরের লোক দেখলে কি ভাববে ?

আমি বলি—বাইরের লোকে কি ভাববে সে বিষয়ে আমার কৌতূহল নেই। কিন্তু ভিতরের লোকে কি ভাবছে ?

একটা তির্যক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পর্ণা বলে—এ কথার মানে ?

—মানে, তুমি কী ভাবছ ?

এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে পর্ণা বলে—যা ভাবা স্বাভাবিক তাই ভাবছি।

মনে মনে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ি। কি বলতে চায় পর্ণা? সে কি ভাবছে আমি প্রেমে পড়েছি ? সেটাই কি স্বাভাবিক ওর কাছে ? আমার আচরণ কি তাই বলছে নাকি ওকে ? অথবা ও বলতে চায়, বড়লোকের ছেলে যেভাবে তার স্টেনোর সঙ্গে নিষ্প্রেম ফ্লার্ট করে, আমি তাই করছি ? কিন্তু ওকে প্রশ্ন করে কি হবে ? আমি নিজেকেই সেই প্রশ্ন করলে কি জবাব দেব ? সত্যি, কেন আজ এ রকম কাণ্ডটা করছি ? বন্ধুত্ব? পর্ণা যদি আমার পুরুষ-স্টেনো হত তাহলে এই অদ্ভুত কাণ্ডটা আজ করতে পারতুম ? এক সঙ্গে সিনেমা দেখা ? এক সঙ্গে পানাহার ? তা হলে ? ওর নারীত্ব সত্তাই কি আমাকে টেনে এনেছে এখানে ? কিন্তু আত্মসমীক্ষা পরে করা যাবে। আপাতত পর্ণা এই সিচুয়েশানটা কী ভাবে নিচ্ছে জানা দরকার। বললুম—হ্যাঁ, কিন্তু স্বাভাবিক কোনটা ?

পর্ণা কাঁটা ও ছুরি ন্যাপকিনের প্লেটে ঠুকতে ঠুকতে বলে—আমিও তো ঠিক সে কথাই ভাবছি। স্বাভাবিক কোনটা। তোমার-আমার

সম্পর্কটা প্রভু-ভৃত্যের, কিন্তু তোমার আজকের আচরণে মনে হচ্ছে যে, কথাটা তুমি ভুলে বসে আছো। সে কথাটা মনে করিয়ে দিলেও শুনতে পাবে না তুমি!

আমি বলি—'ইফ দাউ আর্ট এ মাস্টার, সামটাইম্‌স্ বি ব্লাইণ্ড!'

—কার কথা?

পর্ণা বলে—পরের লাইনটা হচ্ছে—'ইফ এ সার্ভেন্ট, সামটাইম্‌স্ বি ডেফ!'—তুমি আজ প্রভু হয়েও অন্ধ আর আমি দাসী হয়েও বধির!

আমি একটু ক্ষুন্ন হয়ে বলি—কিন্তু ঐ 'দাসী' কথাটা ঠিক স্যুট করছে না।

—ও! ওটা বুঝি একমাত্র মিসেস্ মুখার্জির বলার কথা?

আমি বিরক্ত হয়ে বলি—তার কথা থাক!

—ও! কিছু মনে করবেন না!—সামলে নেয় পর্ণা!

সুর কেটে যায়। ঠিক ঐ পরিবেশে কি জানি কেন সুনন্দাকে নিয়ে ওর ঠাট্টাটা আমার ভাল লাগেনি। আমার স্বরটা বোধহয় কড়া হয়ে গিয়েছিল। তাই ওরও সুর গেল বদলে। ঠিক সেই মুহূর্তেই বয়টা দিয়ে গেল পানপাত্র আর খাবার।

যেন কিছুই হয়নি এমনভাবে আমি আবার আলাপটা শুরু করি —মানিকতলার বাসায় কে আছে তোমার?

আমার দিকে আয়ত দুটি-চোখ মেলে পর্ণা বলে—তার কথাও থাক!

বুঝি, অভিমান করছে ও। তাই ভিন্ন সুরে বলি—বেশ, তাহলে এস আমরা এমন একটা সাবজেক্ট নিয়ে আলোচনা করি যাতে দুজনেরই ইন্টারেস্ট আছে।

—যথা?

—যথা 'দি গেম অফ কোটেশনস্'।

—বেশ বলুন।

পাত্রে পানীয় ঢালতে ঢালতে বললুম—ঠিক এই মুহূর্তে যেন

জন্‌সনের একটা উক্তি আমার মনে পড়ছে। কি উক্তি বলতে পার?

অনেকক্ষণ চুপ করে রইল পর্ণা। তারপর বলল—পারি!

—না, পার না। আচ্ছা বল দেখি।

চটুল হাস্যে পর্ণা বললে—নিশ্চিত পারি। কিন্তু বলতে পারব না।

—পারি, অথচ পারি না?

—মানে মুখে বলতে পারব না।

—বেশ লিখে দাও।

মানিব্যাগ খুলে একটা নাম-লেখা কার্ড আর কলমটা ওর দিকে এগিয়ে দেই। কলমটা খুলে ও বলল—একটা শর্ত, আজ রাত্রে এটি তুমি দেখতে পাবে না।

বললুম—বেশ।

সে শর্ত আমি রাখিনি। নির্জন সিনেমা 'হলে' ওকে বসিয়ে দিয়ে আমি আবার বেরিয়ে এসেছিলুম। দুরন্ত কৌতূহল হচ্ছিল জানতে, বেন জনসনের কোটেশানখানা ও স্পট্ করতে পেরেছে কিনা। লাইট হাউসের বারে দাঁড়িয়ে বার করলুম সেই কার্ডখানা। আশ্চর্য মেয়ে! ঠিক স্পট করেছে সে। আঁকা বাঁকা অক্ষরে লেখা আছে—ঠিক সেই মুহূর্তটিতে যে কথা আমার মনে পড়েছিল—'লীভ বাট এ কিস্ ইন দ্য কাপ, অ্যাণ্ড আই উইল নট লুক ফর ওয়াইন।'

সিনেমা দেখে রাত একটার সময় ওকে নামিয়ে দিলুম মানিকতলার মোড়ে। বললুম—একটা কথা পর্ণা! কাগজখানা আমি দেখেছি! লোভ সামলাতে পারিনি।

পর্ণা কোনও জবাব দেয় না।

নির্জন পথের ধারে ওকে নামিয়ে দেবার সময় বলি—কেমন করে আন্দাজ করলে তুমি?

ও বললে—কিন্তু তুমি কথা দিয়েছিলে আজ রাতে ওটা দেখবে না!

—সেটা কথা নয়; কথার কথা।

ও নেমে যাবে বলে দরজাটা খোলে। আমি ওর হাতটা চেপে ধরে বলি—কিন্তু আমার মনের কথা কেমন করে জানতে পারলে তুমি।

মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে পর্ণা বলে—একটু চেষ্টা করলেই তা জানা যায়। এই মুহূর্তে কবি ডনের একটা উদ্ধৃতি আমার মনে জেগেছে —তাও কি তুমি আন্দাজ করতে পার না?

ও পাশ থেকে মোড়ের পুলিশটা এগিয়ে আসছে! আমি বলি—সেটা কি আমার প্রশ্নের জবাব?

—হ্যাঁ!

—কী বল। আর সময় নেই। আমি হার স্বীকার করছি।

ও বললে—'বেটার ডাই দ্যান্ কিস্ উইদাউট ল্যভ্।

হাতটা ছেড়ে দিলুম ওর।

এসব কথা সুনন্দাকে বলা যায় না। ভেবেছিলুম ওকে শুধু বলব—শ্রমিক-বিদ্রোহ দমনের অস্ত্র হিসাবেই পর্ণাকে ব্যবহার করছি আমি। সেজন্য তার সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করতে হচ্ছে আমাকে। তাকে খুশী রাখা প্রয়োজন। এর ভেতর অন্যায় কিছু নেই—কোন নৈতিক সীমা-রেখা আমরা অতিক্রম করিনি। সুনন্দার প্রতি আমি কোন কারণেই অপরাধী নই। একদিন যখন বিদ্রোহ মিটে যাবে তখন সুনন্দাকে সব কথা না হয় বুঝিয়ে বলব। আমি নিজের কাছে যখন খাঁটি আছি তখন সুনন্দাকে যেচে কৈফিয়ৎ দিতে যাবার কি প্রয়োজন? সাবধানে পর্ণাকে ব্যবহার করব। আগ্নেয়াস্ত্র সাবধানে, গোপনে রাখাই বিধি; কিন্তু ব্যবহারের পর নিক্ষিপ্ত বুলেট লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কোন জঙ্গলে গিয়ে পড়ে কে আর তার সন্ধান রাখে? আর লক্ষ্যভ্রষ্ট না হলে? তখনও বুলেটের আর দ্বিতীয়বার বিস্ফোরণের ক্ষমতা থাকে না।

কদিন ধরে এসব ভাবছিলুম। সুনন্দাকে কি বলব না বলব স্থির করার আগেই হঠাৎ সুনন্দা আমাকে চ্যালেঞ্জ করে বসল।

অগত্যা অগ্নিগর্ভ আগ্নেয়াস্ত্রটির অস্তিত্ব অস্বীকার করা ছাড়া আমার আর পথ রইল না।

আর একটা কথা!

আমি কি সত্যিই সমালোচনার উর্ধ্বে? আমার সব ব্যবহারই কি নৈতিক সীমারেখার ভিতরে ছিল? কবি ডনের চাবুক না পড়লে সে রাত্রে কি নিজেকে সংযত করতে পারতুম? আমি ভেবেছিলুম, ওর মনে যে উদ্ধৃতিটা জেগেছে সেটা—'স্টোল্‌ন কিসেস্‌ আর অলওয়েজ দ্য সুইটেস্ট!' মনের অগোচরে পাপ নেই। অন্তত আমার মনে তখন ঐ উদ্ধৃতিটাই জেগেছিল।

এসব কথা নন্দাকে বলা যায় না। তবু কিছুটা ওকে বলতে হল। কারখানায় আমার ইনফর্মার আছে, তেমনি নন্দারও কেউ আছে নাকি? মিশির? রামলাল? পর্ণা সংক্রান্ত কয়েকটি বাঁকা বাঁকা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতেই মত বদলালুম। 'লেট অল য়ু সে বি হাফ-ট্রুথ!' বললুম, পর্ণাকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করব স্থির করেছি। 'দেওয়ালের লিখনের' প্রুফ কেমন করে সে জোগাড় করেছিল তাও বললুম। শুনে ও গুম মেরে গেল।

কিন্তু গত শনিবার যে কাণ্ডটা ঘটেছে তারপর আমি নিজেই হালে পানি পাচ্ছি না। ঘরে বাইরে কত দিকে নজর রাখতে পারে একটা মানুষ?

শনিবারে আমার আসানসোল যাবার কথা ছিল। বাড়িতে বলে গিয়েছিলুম রাতে আর ফিরব না। কিন্তু অফিসের গণ্ডগোলে মত বদলাতে হল। সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজকর্ম করতে হল অফিসে বসেই। ছুটির পর পর্ণাকে বললুম—চল, কোথাও চা খাওয়া যাক।

ও বলে—না আজ থাক। আজও আমার একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

—সিনেমা শো?

—না। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

—কোন পাড়ায় ?

—বেলেঘাটায়।

—বেশ চল, আমার গাড়িতেই পৌঁছে দিই।

—চল।

ওকে নিয়ে বেলেঘাটার মোড়ে পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসছি। ট্রাফিক পুলিশ হাত দেখিয়েছে। গাড়িটা গীয়ারে রেখে অপেক্ষা করছি। আমার পাশেই এসে দাঁড়াল একটা দোতলা বাস। সেদিকে তাকিয়ে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। লেডিস সীটে বসে আছে একটি মেয়ে। সাধারণ একটা ছাপা পাড়ি—বেশ ময়লাই, গায়ে কোন গহনা নেই। বসে আছে জানলার ধারে। তার পাশে একজন পুরুষও আছে মনে হল। তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মেয়েটি একবার মাত্র তাকাল—আর চমকে উঠলুম আমি।

সুনন্দা !

নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না। বেলেঘাটার বাসে ময়লা শাড়ি পরে বসে আছে সুনন্দা ! অলক মুখার্জির স্ত্রী। পিছনের গাড়ির প্রচণ্ড হর্নে যখন সম্বিত ফিরে এল ততক্ষণে দোতলা বাসটা অনেকটা এগিয়ে গেছে। ভুলে গেলুম গন্তব্যস্থল। ঐ বাসটার পিছনে ছুটতে থাকি আমি। কিন্তু বৃথাই। পরের মোড়ে সবুজ আলোর সঙ্কেত পেয়ে সে বেরিয়ে গেল; কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছবার আগেই এল লাল বাতির নিষেধ। অল্প পরেই অবশ্য বাসটাকে ওভারটেক করলুম। সে সীটে বসে আছে অন্য দুজন।

কোথায় নেমে গেল ওরা ? দ্রুত বেগে ফিরে এলুম বাড়িতে। যা ভেবেছি তাই। সুনন্দা অনুপস্থিত। সেই যে দুপুরে বেরিয়ে গেছে এখনও আসেনি। কোথায় গেছে কেউ জানে না। অপেক্ষা করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। অপেক্ষাই করতে হল। রাত নয়টা নাগাদ ফিরে এল সে। আমাকে দেখে সে যতটা চমকে ওঠে তার চেয়ে আমি

চমকে উঠি অনেক বেশী। সুনন্দার পরিধানে একখানা মাইশোর জর্জেট, আভরণের কমতি নেই তার দেহে।

—এ কি আসানসোল যাওনি তুমি?

—না। কিন্তু তুমি কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

—তুমি নেই, তাই একটু আড্ডা দিয়ে এলাম।

—ও! কোথায়?

—নমিতাদের বাড়ি! খেয়ে এসেছ, না খাবে?

খেয়ে আমি আসিনি; কিন্তু খাবার স্পৃহাও চলে গিয়েছিল। বললুম—খাব না, তুমি খেয়ে নাও।

পরদিন ফোন করেছিলুম নমিতাকে। আশ্চর্য, সে বলল—হ্যাঁ, নন্দা তো এসেছিল কাল। সারাটা দুপুরে ছিল এখানে। কেন বলুন তো?

—না, এমনিই?

কিন্তু নিজের চোখকে আমি অবিশ্বাস করি কি করে?

পর্ণা আর নন্দা। ভেবেছিলুম দুজনকেই আমার আয়ত্বের মধ্যে পেয়েছি। দুজনেই আমার হাতের পুতুল মাত্র। আজ মনে হচ্ছে সেটা আমার ভুল ধারণা। আমিই বোধহয় ওদের হাতের পুতুল! ঠিকই বলেছেন ভিক্টর হুগো—'মেন আর উইমেন্‌স্‌ প্লে-থিং; উয়োম্যান ইজ্‌ দ্য ডেভিল'স্‌!'

॥ চার ॥

কোথায় যেন গল্প শুনেছিলাম, একজনের মনের মধ্যে শনি প্রবেশ করেছিল। সে দেখলে, তার ঘরের সামনে দিয়ে একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে যাচ্ছে। মেয়েটিকে সে বাড়িতে আনবার জন্যে আমন্ত্রণ করল। মেয়েটি বলে—'তুমি আমাকে পথ থেকে ডেকে নিয়ে যাচ্ছ?

কিন্তু শুনে রাখ বাপু, আমি হচ্ছি অলক্ষ্মী—যার সংসারে একবার আমি ঢুকি তাকে আমি ছারখার করে দিই।'

লোকটি বলে—'আমিও তাই চাই। জানো না, আমার শনির দশা চলেছে, আমার সুবুদ্ধি সব লোপ পেয়েছে। এসো মা, আমার ঘরে এসো।'

আমারও যেন সেই দশা!

দিব্যি সুখে সচ্ছন্দে দিন কেটে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘাড়ে যেন শনি চাপল। আমাকে বলল—'ঐ দেখ, পথ দিয়ে অলক্ষ্মী যাচ্ছে, ওকে ডেকে নিয়ে এসো!'

মনের মধ্যে সুবুদ্ধি বলে উঠল—'ওরে, অমন কাজ করিস না। ও তোর সুখের সংসার ছারখারে দেবে।'

আমি তখন বধির হয়েছিলাম, সুবুদ্ধির উপদেশ আমি শুনিনি।

বড্ড বেশী বিশ্বাস করতাম অলককে। বড় গর্ব ছিল আমার। আমার ড্রেসিং টেবিলের আয়নাটার ভিতর যে অপূর্বসুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে আমার নিত্য সাক্ষাৎ হয়, ওর উপর বড় বেশী আস্থা রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, ঐ ড্রেসিং টেবিলের আয়নার ও-প্রান্তে সন্ধ্যাবেলায় মাথায় গোলাপফুল গুঁজে যে মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে রোজ মিটিমিটি হাসে তার প্রেমে বুঝি পাগল হয়ে আছে অলক। একটা কালো কুৎসিত স্লেট-পেনসিলের সাধ্যও হবে না সে গ্র্যানাইট-প্রেমের গায়ে আঁচড় কাটতে। কিন্তু কেন এ কথা ভাবলাম? অসম্ভবকে কি ইতিপূর্বেই সম্ভব করেনি পর্ণা? গৌতমকে কি ছিনিয়ে নেয়নি আমার আঁচলের গিঁট খুলে?

কিন্তু কেন এসব ভাবছি পাগলের মতো? সবই হয়তো আমার কপোলকল্পনা। অলক তো বলছে, বিশ্বকর্মা পূজার আগে ঐ নোংরা একগুঁয়ে মজুরগুলো নাকি ধর্মঘট করতে চায়! এই জন্যই তার কাজ বেড়ে গেছে। বাড়ি ফিরতে রোজ রাত হচ্ছে। হোক রাত, ও তো অফিসেই থাকে। সেটা পরীক্ষা করে জেনেছি। রাত ন'টা

বাজলেই অফিসে টেলিফোন করি। সাড়া পাই। ও বলে, আর একটু দেরি আছে। পর্ণাও কি থাকে ওখানে অত রাত পর্যন্ত? জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ হয়। কিন্তু থাকলেই বা কি? অফিসে আরও লোক থাকে, দোবেজী থাকে। হাজার হোক সেটা অফিস। অত ভয় কি আমার?

ভয় কি সাধে! আমি যে জানি, ও হচ্ছে—বিষকন্যা! ও এসেছে আমার সুখের সংসারে আগুন দিতে।

সেদিন অলকের মন বুঝবার জন্যে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করলাম—'তুমি বলেছিলে পর্ণাকে একদিন বাড়িতে আনবে, কই আনলে না তো?'

ও বললে—'না, ভেবে দেখলাম সেটা উচিত হবে না। হতে পারে এককালে সে তোমার সঙ্গে পড়তো—কিন্তু এখন তোমার সঙ্গে তার আসমান-জমিন ফারাক। এই তফাতটা বজায় রাখাই ভালো। আর তাছাড়া মেয়েটি খুব সুবিধেরও নয়, তোমার মুখের উপরই বলছি—লাই দিলেই হয়ত মাথায় উঠতে চাইবে।'

শুনে আশ্বস্ত হলাম। পর্ণাকে তাহলে ঠিকই চিনেছে ও। হাজার হোক অলক মুখার্জি গৌতম নয়! অত সহজে গলে যাবার মতো মাখনের মানুষ নয় সে।

তবু আমার মন যেন কাঁটা হয়ে থাকে। কোথাও কোনও ছায়া দেখলেই আমার মনে হয় এ বুঝি গ্রহণের পূর্বাভাস। বিষকন্যার বিষের নিশ্বাসের শব্দ যেন শুনতে পাই মাঝে মাঝে। কত সামান্য কারণে আঁতকে উঠি। সেদিন গাড়ির ভিতর একটা সেন্ট-সুরভিত লেডিস-রুমাল কুড়িয়ে পেয়ে ঐভাবে আঁতকে উঠেছিলাম। অলক যখন বললে যে, সে আমারই জন্য রুমালটা কিনেছিল—তারপরে কখন পকেট থেকে পড়ে গেছে জানে না, তখন নিশ্চিন্ত হই।

কিন্তু মদের মাত্রাটা আজকাল আবার বাড়িয়েছে। লক্ষ্য করেছি, যখনই ওর মনে দ্বন্দ্ব আসে ও মাত্রা বাড়ায়। আমার অসুখের সময় যেমন হয়েছিল। কী কেলেঙ্কারী কাণ্ড হয়েছিল সেবার! এবার অবশ্য

মাত্রা বাড়াবার সংগত কারণ আছে। শ্রমিক-ধর্মঘট! কিন্তু অলক তো বারে বারে বলেছে, সে সব মিটমাট হয়ে যাবে। সেটুকু বিশ্বাস আমারও আছে। বিশ্বকর্মা পূজার আগেই সব মিটমাট হয়ে যাবে। পূজার পরেই এবার ছাঁটাই করতে বলব ওর স্টোনোকে। অলকই তো বলেছে অতি অপদার্থ মেয়েটা। কী দরকার ওকে রাখার? ওকে ডেকে এনেছিলাম একদিন সুযোগমতো অপদস্থ করব বলে—সেটা সেরে নেব এবার। বেশীদিন ওকে রাখা দুঃসাহসের কাজ হবে। সব কথা বরং অলককে খুলে বলি। দরকার হয় গৌতমের কথাও। বিয়ের আগে যদি গৌতমকে ভালবেসে থাকি—সে কি আমার অপরাধ? আজকালকার ছেলে-মেয়েদের প্রাক্‌বিবাহ জীবনের ইতিহাসে অমন এক-আধটা অধ্যায় থাকেই। শুনলে অলকের মূর্ছা যাবার কোন কারণ নেই। এত বছর ঘর করার পর এ নিয়ে নতুন করে মান-অভিমানের কোন অর্থ হয় না। আর হলেও বাঁচি। অন্তত তাতেও এই একঘেয়ে জীবনে একটা বৈচিত্র্য আসবে। না হয় থাকলোই দুদিন অভিমান করে। তবু সব কথা ওকে খুলে বলতে হবে—আর অনুরোধ করব, ঐ মেয়েটাকে ছাঁটাই করতে। অনুরোধ কেন? বাধ্য করব। আমার কথা ও কোনদিন ঠেলতে পারে না, পারবেও না!

কিন্তু তার আগে বিশ্বকর্মা পূজা!

বছরে এই একটি দিন! শাড়ী-সজ্জার এক প্রদর্শনী! কারখানার মাঠে শামিয়ানা খাটিয়ে মঞ্চ বাঁধা হয়। সামনে গদি-আঁটা খানকয়েক চেয়ার খালি থাকে বিশিষ্ট অতিথিদের জন্য। অভিনয় শুরু হওয়ার আগে হয় পুরস্কার বিতরণী। বাৎসরিক স্পোর্টসে যারা প্রথম, দ্বিতীয় হয়েছে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। মঞ্চের উপর সাজানো থাকে নানান উপহার। গদি-আঁটা চেয়ারে আমাকে গিয়ে বসতে হয় মঞ্চের উপর। পাদপীঠের জোরালো আলোয় ঝলমল করতে থাকে আমার সর্বাঙ্গ! একে একে নাম ডাকে কেউ। আমি হাতে তুলে দিই

পুরস্কারগুলি। ওরা হাত পেতে নিয়ে যেন ধন্য হয়ে যায়। নত হয়ে নমস্কার জানায়। সে নতি, আমি জানি, শুধু কারখানার মালিক-পত্নীকে নয়—সে নতি ওরা জানায় সৌন্দর্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে। বার্ষিক স্পোর্ট´সে ওরা যে আপ্রাণ দৌড়ায়, লাফায়, সে কি শুধু ঐ পুরস্কারগুলির লোভে? মোটেও নয়! দৌড়াবার সময় ওদের মনে পড়ে এই মুহূর্তটার ছবি—যে মুহূর্তটিতে ওরা আসে আমার সেণ্ট-সুরভিত সান্নিধ্যে, হাত পেতে প্রসাদ নিতে।

এবারও আমি গিয়ে বসব ডায়াসে। এবার প'রে যাব সবুজ রঙের নাইলনটা। পান্নার জড়োয়া সেটটা পরব সেদিন। মাথায় দেব জুঁইয়ের একটা মালা। আগে থেকেই অলককে বলে রাখব, যেন পর্ণাকে নেওয়া হয় অভ্যর্থনা-কমিটিতে। পাশেই ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হবে ওকে। আমার পক্ষে তাকে চিনতে পারা শক্ত। কারখানায় কত কর্মী, আমি কি করে চিনব? পর্ণা নিশ্চয়ই স্তম্ভিত হয়ে যাবে। হঠাৎ বুঝতে পারবে—যে ধনকুবেরের অধীনে চাকরি পাওয়ার আশায় সে একদিন আবেদনে লিখেছিল—এই অসহায় দরিদ্র রমণীকে দয়া করে কাজটি দিলে প্রতিদানে কর্মক্ষেত্রে সে সকল শক্তি প্রয়োগ করবে—সেই 'অফিস-বস', সেই বড়সাহেবের সঙ্গে রীতিমতো 'ল্যভ-ম্যারেজ' হয়েছে সুনন্দা মুখার্জির! মনিব-গিন্নী! কথাটা ভাবলেও হাসি পায়। পর্ণা নিশ্চয়ই গম্ভীর হয়ে যাবে। হঠাৎ মাথা ধরার অছিলায় সরে পড়তে চাইবে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ার অজুহাত ছাড়া তার আর উপায় কি? কিন্তু ওগো পর্ণা দেবী। আলমগীর যে ভুল করেছিলেন আমি তা করব না। অসুস্থতার অজুহাতে তোমাকে আমার কারাগার থেকে পালাতে দেব না! সে না অভ্যর্থনা-কমিটির লোক! দায়িত্ববোধ নেই ওর? পর্ণাকে ডেকে বলব—'আপনি বুঝি—'; না—'আপনি' কেন? বলব—'তুমিই বুঝি ওর স্টেনো? আই সী! এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও না ভাই।' বলব—'আমার ড্রাইভারকে একটু ডেকে দাও না লক্ষ্মীটি—না না

বিউইকটা নয়—ওটা তোমার সাহেবের—আমার ড্রাইভার আছে আমার গাড়িতে—হ্যাঁ, ঐ কালো পন্টিয়াকটায়—থ্যাঙ্ক য়্যু!'

পর্ণা নিশ্চয়ই আজও জানে না, তার বড়সাহেবের মেম-সাহেবটি কেমন মানুষ। রূপের প্রশংসা শুনে থাকবে সহকর্মীদের কাছে। নিশ্চয়ই তার কৌতূহল আছে প্রচণ্ড। হয়তো বেচারী উদ্‌গ্রীব হয়ে আছে এই সুযোগে মনিব-গিন্নীকে একটু 'লুব্রিকেট' করতে। চাকরি জীবনে 'অসহায় দরিদ্র রমণীর' তোষামোদই তো একমাত্র উন্নতির সোপান। বিশ্বকর্মা পূজার আর মাত্র এক সপ্তাহ বাকি। অলকের ব্যস্ততার আর সীমা নেই। শুনেছি, ব্যস্ততার কারণ পূজা নয়—শ্রমিক-য়ুনিয়ানের গণ্ডগোলের জন্যই। কিছুদিন হল শ্রমিক-মালিক সম্পর্কটা খুব তিক্ত হয়ে উঠেছে। এরা মাঝে মাঝে ছাঁটাই করছে অবাঞ্ছিত শ্রমিক নেতাকে, ও পক্ষ করছে টোকন-ধর্মঘট অথবা অবস্থান-ধর্মঘট। অবস্থাটা ক্রমেই ঘোরালো হয়ে উঠছে। অলক অবশ্য বারে বারে বলছে, শ্রমিক-উপস্থিতির লালকালির দাগটা এখনও সমান্তরালই আছে—কিন্তু ও নাকি গোপনে সংবাদ পেয়েছে, চার্টের দাগটা যে কোন দিন অতল খাদের দিকে হুমড়ি খেয়ে সোজা নেমে যেতে পারে। কিন্তু ভয় তো আমার ধর্মঘটকে নয়!

সেদিন বলেছিলাম—'সন্ধ্যার পর বাড়িতে বসেই কাজ করলে পার?'

ও বলে—'কেন, ভয়টা কিসের? তোমার বান্ধবীকে তো? যখন তোমাদের সঙ্গে কলেজে পড়তেন তখন তাঁর কি মূর্তি ছিল জানি না, কিন্তু এখন তাঁর চেহারাটা যদি একবার দেখতে তো বুঝতে পারতে যে, তোমার ভয়ের কোন কারণ নেই।'

আমি বলি—'আ হা হা! আমি যেন তাই বলছি!'

ও আমাকে আদর করে বলে—'যার ঘরের কোণে এমন ভরা পাত্র—ঝরণাতলার উছল পাত্রটার দিকে তার নজর যায় কখনও?'

কী কথার ছিরি! আজকাল আবার মাঝে মাঝে বাঙলায় উদ্ধৃতি

দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমাকে খুশী করার জন্য। এর চেয়ে ইংরেজী বুকনিও ছিল ভালো। অন্তত যা বলতে চায়, তার মানে বোঝা যায়। উপমান-উপমেয়ের তফাত যে বোঝে না—সে কেন এমনভাবে চাল দিয়ে কথা বলতে যায়? রবিবাবুর উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলার ফ্যাশন যেন একটা মুদ্রাদোষ আজকালকার ছেলেদের!

কিন্তু যে কারণেই হোক, অলক শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গেল আমার কাছে। ও স্বীকার করল, পর্ণাকে সে ব্যবহার করতে চায় কাঁটা তোলার কাজে। একখণ্ড সাপ্তাহিক পত্রিকা দেখিয়ে বললে—মেয়েটা কাজের আছে। এই কাগজের অফিস থেকে এক সিট গ্যালি প্রুফ চুরি করে এনেছে। কাগজটা হাতে নিয়ে অবাক হয়ে গেলাম আমি। চার পাতার একটা সাপ্তাহিক। বিজ্ঞাপন কিছুই নেই। ভাঙ্গা টাইপ, খেলো কাগজ। প্রথম বর্ষ, সপ্তম সংখ্যা। অর্থাৎ যে ধরণের কাগজ নিত্য বের হয়, নিত্য বন্ধ হয়। কিন্তু আমার দৃষ্টি আটকে গেল সম্পাদকের নামটায়। সম্পাদক— গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়!

আমি ডুবে গিয়েছিলাম অতীতের আমিতে। অলকের কথা আর কানে যায়নি আমার। কলেজ জীবনে আমরা এই নিয়ে কত স্বপ্ন দেখেছি—আমরা একটি কাগজ বার করব। আমি আর গৌতম। আমি তার প্রুফ-রীডার-কাম-ম্যানেজার, গৌতম তার পাবলিসিটি অফিসার-কাম এডিটর। আমাদের পুঁজি অল্প, কিন্তু আদর্শ বিরাট। বিজ্ঞাপনের উপর নির্ভর করব না আমরা। মেহনতী মানুষদের কথা থাকবে তাতে। কৃষককে, শ্রমিককে যারা শোষণ করছে তাদের মৃত্যুবীজ বপন করে যাব আমরা ঐ কাগজে। হয়তো সে চারাগাছের মহীরুহরূপ দেখতে পাব না আমরা; কিন্তু আমাদের বিশ্বাস ছিল সে গাছ একদিন ফল দেবেই! আমাদের সেই কল্প-লোকের পত্রিকার নামকরণ আমিই করেছিলাম—"দেওয়ালের লিখন।" আগামী দিনের হুঁশিয়ারি থাকবে আমাদের সেই কাগজে। যাদের চোখ আছে তারা পড়ে নাও—"রাইটিংস অন দ্য ওয়াল।"

আশ্চর্য! সেই কাগজ এতদিনে বার করেছে গৌতম। আর তার চেয়েও বড় কথা, সে আমার দেওয়া নামটাই বজায় রেখেছে। তা রাখুক, তবু আমি বলতে বাধ্য গৌতম আদর্শচ্যুত। লক্ষ্যভ্রষ্ট ব্রাত্য সে। যারা সত্যিকারের সর্বনাশ ডেকে আনছে দেশের, কোটি কোটি টাকা করেন এক্সচেঞ্জ ফাঁকি দিচ্ছে, ইনকাম ট্যাক্স ফাঁকি দিচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে গৌতমের কলম রুদ্ধবাক। তার যত গর্জন এই অলক মুখুজ্জেদের মতো চুনো পুঁটির উপর। অলক ইনকামট্যাক্স ফাঁকি দেয় না, কালোবাজারি করে না, শ্রমিদের স্বার্থ সব সময়েই দেখে—তবু তার উপরেই ওর যত আক্রোশ। কেন? সে কি জানে যে, তার সুনন্দাকে ছিনিয়ে নিয়েছে ঐ অলক? না, তা তো সে জানে না। জানার কথা নয়। তাহলে?

আর পর্ণা? তার কথা তো জলের মত পরিষ্কার। গৌতম ব্যানার্জি শেষ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছে কালনাগিনীর স্বরূপ। পাত্তা দেয়নি পর্ণাকে, তাই আজও মিস্ পর্ণা রায় চাকরি করে জীবনধারণ করছে। পর্ণা তাই গৌতমের উপর প্রতিশোধ নিতে বসেছে। তার খবর গোপনে বেচে আসছে অলকের কাছে। এ কথা গৌতমকে জানিয়ে দিলে কেমন হয়? কিন্তু না। তাতে অলকের ক্ষতি।

ঠিক করলুম, অলককে অবাক করে দিতে হবে। যে কাজ পর্ণা পারে তা যে আরও সুচারুরূপে সুনন্দা পারে, এটা অলকের কাছে প্রমাণ করা চাই। না হলে এখানেও হার হবে আমার।

যে কথা সেই কাজ। পত্রিকা অফিসের ঠিকানাটা লিখে নিলাম এক টুকরো কাগজে। মতলব ঠিক করাই আছে। সোজা চলে গেলাম নমিতাদের বাড়ি। মন গড়া এক আষাঢ়ে গল্প শোনাতে হল তাকে। আমার এক গরীব বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যাব। তাই ভাল শাড়িটা তার কাছে রেখে, গহনাপত্র খুলে রেখে যাব সেখানে। নমিতা বুদ্ধিমতী। বলে—বান্ধবী না হয়ে যদি বন্ধুই হয়, আমার আপত্তি কি?

আমি বলি—তোর মন ভারি সন্দেহবাতিক।

নমিতা হেসে বলে— কিন্তু মিস্টার মুখার্জি কোথায়?

—আজ আসানসোলে গেছে। কাল ফিরবে।

—তাই বুঝি আজ বান্ধবীকে মনে পড়েছে?

আমি আর কথা বাড়াতে দিই না।

বেলাঘাটার বাসে চেপে মনে হল—কাজটা কি ঠিক হচ্ছে? আমাকে যদি এ বেশে কেউ দেখে ফেলে? আমাদের সমাজের বড় একটা কেউ বাসে চাপে না। সেদিক থেকে ভয় নেই। কিন্তু ওর কারখানার কত লোক আমাকে চেনে, যাদের আমি চিনি না। বাসের ঐ কোণায় ঐ যে বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে আছেন, তখন থেকে দেখছি উনি আমাকে লক্ষ্য করছেন। সে কি শুধু আমার রূপের জন্য? না কি আমার পরিচয় জানেন উনি? অবাক হয়ে ভাবছেন—মাথা খারাপ হয়েছে না কি মিসেস্ মুখার্জির। কিন্তু না। অত শত ভাবতে গেলে আমার চলে না। আমি তো আমার যমজ বোনও হতে পারি ওরা কি জানে, অলক মুখার্জির শালীকে দেখতে ঠিক তার স্ত্রীর মতো কিনা?

গাড়ি চলেছে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। ক্রমে লোকজনে বাসটা বোঝাই হয়ে গেল। নামব কি করে রে বাবা? ফুটবোর্ডে বাদুড়-ঝোলা হয়ে মানুষ ঝুলছে যে! কি করে বাসে ট্রামে মেয়েরা যায়? শালীনতা রক্ষা করাই দায়।

গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকি বাইরে জনতার স্রোত। আজ ওদের সঙ্গে একটা একাত্মতা অনুভব করছি। আজ আমি ওদেরই একজন। আজ আমার সাধারণ মিলের শাড়ি, হাতে কাঁচের চুড়ি—গলায় প্যাক কোম্পানির মেকি হার কানে পুঁতির দুল! আজ আমি মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে। চাকরি করি রেশনের দোকানে লাইন দিই, সন্ধ্যাবেলায় ছোট ছোট মেয়েদের নিয়ে অন্ধকার স্যাঁৎসাতে ঘরে প্রাইভেট ট্যুইশানি করি।

—বেগবাগান, বেগবাগান!

একদল মানুষ নামছে, একদল উঠতে চাইছে। কী অমানুষিক প্রচেষ্টা! কেউ কারও তোয়াক্কা রাখে না। ধাক্কা দিয়ে, ঠেলা দিয়ে মানুষ উঠছে অথবা নামছে। আমিও কি নামবার সময় ও রকম কনুইয়ের গুঁতো মারব নাকি? পারব?

—টিকিট?

কণ্ডাকটার এসে দাঁড়িয়েছে ভীড়ের মধ্যেও।

ছোট্ট হাত ব্যাগ খুলে বার করে দিই নোটটা, বলি—বেলেঘাটার মোড়ে নামব।

—তা নামুন না, কিন্তু দশ টাকার নোটের ভাঙ্গানি নেই। খুচরা দিন।

—কত?

—তিরিশ।

ব্যাগ হাতড়ে দেখি খুচরো মিলিয়ে বিশ নয়া পয়সার বেশী নেই।

কণ্ডাকটার ধমকে ওঠে—ভাঙ্গানি না নিয়ে ওঠেন কেন? এই ভীড়ে দশটাকার ভাঙ্গানি কোথায় পাই আমি?

কৌতূহলী জনতার দৃষ্টি এসে পড়ে আমার উপর। নানা রকম মন্তব্য।—আহা, নেই বলছেন ভদ্রমহিলা, বিশ পয়সারই টিকিট দাও না ভাই।

—দয়া দাক্ষিণ্য করার আমি কে স্যার? স্টেটবাস তো আমার পৈত্রিক সম্পত্তি নয়। ছাড়ব কোন্ আক্কেলে?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তবু আমার হয়ে সুপারিশ করেন—আহা মেয়েছেলে—

ও পাশ থেকে একজন অল্পবয়সী ছোকরা ফোড়ন কাটে—মেয়েছেলে বলে তো মাথা কেনেননি। বাসে ট্রামে দশটাকার নোট যে ভাঙ্গানো যায় না তা জানা নেই ওঁর?

আর একজন বলেন—এ এক চাল! টিকিট ফাঁকি দেওয়ার

ফিকির! বৃদ্ধ তবু আমতা আমতা করে বলেন—তবু মেয়েমানুষ—

—আরে মশাই, আপনার অত দরদ কেন? বয়স তো অনেক হল দাদু!

শুধু আমি নয়, বৃদ্ধও লাল হয়ে ওঠেন সে কথায়।

কণ্ডাকটার তাগাদা দেয়—একটাকার নোট নেই?

বাধ্য হয়ে বলতে হয়—না! সবই দশটাকার!

ছোকরা ফোড়ন কাটে—হায়! হায়! দেবীচৌধুরাণী রে! সবই মোহর!

ভিতরে ভিতরে জ্বলছি তখন আমি। কণ্ডাকটরকে বলি—এই দশটাকার নোটখানিই তুমি রাখ, ভাঙ্গানি দিতে হবে না।

সবাই একটু হকচকিয়ে যায়।

বৃদ্ধ বলেন—সে কি! না হয় আমিই দিয়ে দিচ্ছি কটা পয়সা।

ছোকরা বলে—হ্যাঁ, ওঁর ঠিকানাও বরং জেনে নিন। একদিন পয়সাটা নিয়ে আসবেন! একটু চা-টাও খেয়ে আসবেন।

ও পাশের একজন ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বলেন—আঃ! কী হচ্ছে! ছোকরা বলে—নভেল হচ্ছে দাদা! 'বাস টিকিটের ইতিকথা!'

আমার স্টপেজ এসে গিয়েছিল। উঠে পড়লাম। ভীড় ঠেলে নেমে পড়ি বাস থেকে। জানালা গলিয়ে দশটাকার নোটখানাই ছুঁড়ে দিই কণ্ডাকটারকে। বলি—ভাঙ্গানি হলে ঐ ছোকরাকে দিয়ে দিও। ওর অশ্লীল রসিকতার দাম।

বাস ছেড়ে দেয়।

মেজাজটা খারাপ হয়ে গেছে। তবু ঠিকানা খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছানো গেল সেই একতলার স্যাঁৎসাতে ঘর খানায়।

'দেওয়ালের লিখন' পত্রিকার অফিস। ছোট্ট ঘর। দিনের বেলাতেও আলো জ্বলছে। বিজলি বাতি। অসঙ্কোচে আরশোলা ঘুরছে টেবিলে, মেঝেতে। নড়বড়ে একটা টেবিল। হাতল ভাঙ্গা খান দুই চেয়ার। টেবিলের উপর একরাশ কাগজ, প্রুফ, মাটির ভাঁড়ে

বিড়ির টুকরো। সামনের চেয়ারে বসে আছে যে মানুষটি তাকে দেখলাম দীর্ঘদিন পর। চোখ তুলে সেও দেখল আমাকে। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেল!

ঘরে আরও একজন লোক ছিল। বৃদ্ধ, চোখে চশমা। তাতে মোটা কাচ। সুতো দিয়ে বাঁধা কানের সঙ্গে। সেও ক্যালফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। উপভোগ করলাম দৃষ্টিটা। হাতদুটি বুকের কাছে জড়ো করে বলি—এটাই কি 'দেওয়ালের লিখন' কাগজের অফিস?

গৌতম কথা বলতে পারে না, প্রতি-নমস্কার করতেও ভুলে যায়। বৃদ্ধ ভদ্রলোকই আমার কথার জবাব দেন—হ্যাঁ মা। কাকে খুঁজছেন?

—সম্পাদককে।

—ইনিই।

আমি বসে পড়ি সামনের চেয়ারটায়।

—নমস্কার! আপনিই গৌতমবাবু?

গৌতম সামলে নিয়েছে ততক্ষণে। বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ, কি চান?

—কাগজে আপনারা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন দেখলাম—প্রুফ রীডার চাই। তাই—

বাধা দিয়ে গৌতম বলে—কাগজে বিজ্ঞাপন? কোন কাগজে?

এবার থতমত খেয়ে যেতে হয় আমাকে। একান্তভাবে আশা করেছিলাম, আমার মনগড়া কাহিনীটা গৌতম মেনে নেবে। অন্তত তৃতীয় ব্যক্তির সামনে এভাবে আমাকে জেরা করবে না। কি বলব ভেবে পাই না।

—কই, আমরা তো কোন বিজ্ঞাপন দিইনি! কাটিংটা এনেছেন?

দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—কিন্তু—

একটা বিড়ি ধরিয়ে গৌতম বলে,—মাপ করবেন। ঠিকানা ভুল হয়েছে আপনার। আমরা কোন বিজ্ঞাপন দিইনি।

আমি উঠে পড়ি। সপ্রতিভভাবে বলি—তা হবে! বিরক্ত করে গেলাম, মাপ করবেন আমাকে।

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে গৌতম বলে—বিজ্ঞাপন দিইনি, কিন্তু প্রুফ রীডারের সত্যিই প্রয়োজন আছে আমাদের। আপনি কি এর আগে প্রুফ-রীডিং করেছেন?

এবারে সত্যি কথাই বলি—কলেজ ম্যাগাজিনে এককালে করেছি। দুদিনেই শিখে নিতে পারব।

—অ। লেখাপড়া কতদূর করেছেন?

আপাদমস্তক জ্বলে গেল আমার। সে কথায় জবাব না দিয়ে বলি—এক গ্লাস জল পাব?

বৃদ্ধ শশব্যস্তে বলেন—নিশ্চয়ই। বসুন, দিচ্ছি।

যা ভেবেছিলাম তা হ'ল না। বৃদ্ধকে স্থানত্যাগ করতে হল না। ঘরের ভিতরেই ছিল কুঁজো গ্লাস। এ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে জল এনে দিলেন তিনি।

গৌতম বলল—চা খাবেন?

—খেতে পারি।

—রতনবাবু, মোড়ের দোকান থেকে—

—এক্ষুনি আনছি স্যার—

বৃদ্ধ চলে যেতেই আমি ধমকে উঠি—সব জেনে শুনেও এভাবে আমাকে জেরা করার মানে?

গৌতম হেসে বলে—সব আর জানি কই? বড়লোকের মেয়ে; বি. এ. পাস করলে। বিয়ে করেছ—অথচ তোমার এই হাল!

বললাম—সব কথাই বলতে চাই। চাকরিটা হবে কিনা বল?

—সত্যিই চাকরির দরকার তোমার?

—এখনও সন্দেহ আছে?

—না। কিন্তু তোমার স্বামী—

—স্বামীর কথা থাক!

—তা না হয় থাক, কিন্তু আমার কাগজের যা আর্থিক অবস্থা—

কথাটা ওর শেষ হল না। বৃদ্ধ ফিরে এলেন দুই কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে।

গৌতম বললে—এর বেশী আমরা দিতে পারব না, আপনি রাজী ?

বললাম—রাজী না হয়ে উপায় কি ? তবে কাজ দেখে পরে না হয় কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

—সে পরে দেখা যাবে। আপনি কি এখানে বসেই দেখবেন ? প্রুফ দেব ?

—আজ বরং নিয়ে যাই। কাল এনে দেব।

—বেশ। রতনবাবু, তিন নম্বর পাতার গ্যালিটা এঁকে দিন।

রতনবাবু, একগাদা কাগজ এনে দিলেন আমার হাতে।

চা খাবার পর গৌতম বৃদ্ধকে বলে—আমি একটু বের হব। যদি প্রকাশ আসে বসতে বলবেন। আমি ঘণ্টা খানেকের ভিতরেই ফিরে আসছি।

দুজনেই বেরিয়ে পড়ি অফিস থেকে। পায়ে পায়ে এগিয়ে চলি ফুটপাথ ধরে। একটু দূরে এসে বলি—মাত্র একঘণ্টার সময় নিয়ে এলে ?

গৌতম বলে—চল, ঐ পার্কটায় বসি।

—চল।

পার্ক ঠিক নয়। ফাঁকা মাঠ। এখনও বাড়ি ওঠেনি। বর্ষার জল জমে আছে এখানে ওখানে, তবু ওরই মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় দুজনে বসি। গৌতম বলে—তারপর তোমার কি ব্যাপার ? এ হাল হল কি করে ?

বলি—সে তো দীর্ঘ ইতিহাস। বিয়ে করেছি সে তো দেখতেই পাচ্ছ। স্বামীর রোজগারটাও আন্দাজ করতে পার। আর কি জানতে চাও বল ?

—বাবা বেঁচে আছেন ?

—না।

—ডায়েরী দেখে না ?

—দেখতে চাইলেও আমি দেখতে দেব কেন ?

—ল্যভ-ম্যারেজ ?

হেসে বলি—না, লোকসান-ম্যারেজ !

—থাক কোথায় ?

—ঐ প্রশ্নটার জবাব আমি দেব না।

—ভাল কথা, ফর্মা পিছু দুটাকা করে দেব তোমাকে। তাতে কুলোবে ?

আমি আবার বলি—রাজী না হয়ে উপায় কি ? তবে কাজ দেখে পরে না হয় কিছু বাড়িয়ে দেবেন।

একটু ইতস্তত করে গৌতম বলে—আজ কিছু আগাম নেবে ?

মানিব্যাগ খুলে একটা দশটাকার নোট বার করে। আমি বলি—না! একটা টাকাই দাও এখন! ফেরার ভাড়া। আর এ টাকাটাও আমি দান নিচ্ছি না। তোমার কাগজের নাম দিয়েছি আমি। এ তারই মজুরী।

গৌতম ম্লান হাসলো।

বলি—তোমার খবর কি ?

—কি খবর জানতে চাও ?

—বিয়ে করেছ ?

—করেছি।

হেসে বলি—বউ পছন্দ হয়েছে ?

গৌতমও হেসে বলে—আমি যদি তোমার ভাষায় বলি—স্ত্রীর কথা থাক ?

—আমি বলব, তা না হয় থাক।

গৌতম একটু ইতস্তত করে বলে—পর্ণার খবর জান ?

হঠাৎ কেমন যেন রাগ হয়ে গেল আমার। বললাম—গৌতম,

তুমি যদি চাও—তোমার স্ত্রী এবং আমার স্বামীর গল্পও করতে পার তুমি—কিন্তু ঐ মেয়েটি নাম আর আজকের সন্ধ্যাটায় নাই বা আলোচনা করলাম।

গৌতম হেসে বলে—তার মানে তুমি আজও তাকে হিংসে কর?

আমি বলি, না। তার মানে তুমি আজও তাকে ভুলতে পারনি!

গৌতম প্রতিবাদ করে না।

আর করে না বলেই আমার মনের সুর কেটে যায়।

বিরক্ত হয়ে বলি—কী যে তুমি দেখেছিলে ঐ মেয়েটার মধ্যে—

বাধা দিয়ে গৌতম বলে—কিন্তু এই মাত্র তুমি বললে আজ সন্ধ্যাটায় ওর কথা আমরা আলোচনা করব না।

আমি বিরক্ত হয়ে বলি—হ্যাঁ, তুমি চাও মুখে আমরা ওর কথা আলোচনা করব না। অথচ মনে মনে শুধু তুমি ওর কথাই ভাববে।

গৌতম আবার হেসে বলে—তুমি একটুও বদলাওনি। দি সেম ওল্ড জ্যেলাস্ ইয়াং লেডি!

আমি বলি—বরং কাজের কথা বল শুনি। পত্রিকা কত ছাপছ? ফিনান্স কি রকম? বিজ্ঞাপন নেই দেখলাম। পাচ্ছ না, না নিচ্ছ না! কোন ফিচার দিতে চাও?

গৌতম বলে—কাগজের কথা আজ আলোচনা করতে ইচ্ছে করছে না।

বলি—তাহলে তো মুশ্‌কিল। আমার স্বামীর কথা নয়, তোমার স্ত্রীর কথা নয়, তোমার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের ধ্রুবতারার কথা নয়, এমন কি কাগজের কথাও নয়! তাহলে কি আলোচনা করব আমরা? আজকের ওয়েদার? সিনেমা? রাজনীতি?

গৌতম সে কথার জবাব না দিয়ে বলে—তোমাকে দেখে আজ আমি একেবারে অবাক হয়ে গেছি। সত্যি করে বলত সু, কেন তুমি এসেছ আমার কাছে?

বললাম—কী আশ্চর্য! সে তো আগেই বলেছি, চাকরির চেষ্টায়।

একটু চুপ করে থেকে গৌতম বলে—আমার বিশ্বাস হয় না। কেমন করে তুমি এলে এত নিচে?

—নেমে এলাম না উঠে এলাম?

গৌতম ধমক দিয়ে ওঠে—সিনেমার ভাষায় কথা বলতে চেষ্টা ক'রনা সু! এ দুনিয়ায় বাঁচতে হলে অর্থের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করতে পার না তুমি। তোমার বাপের যথেষ্ট পয়সা ছিল। ভাল ঘরে তোমার বিয়ে হওয়ার কথা—শিক্ষায়, বিদ্যায়, রূপে—

বাধা দিয়ে আমি বলি—এ যুগের ছেলেরা অন্ধ হলে আমি কি করতে পারি গৌতম? রূপের জাল তো বিস্তার করেও ছিলাম। কিন্তু জাল কেটে রুই-কাৎলাগুলো বেরিয়ে গিয়ে যদি কাগজের সম্পাদক হয়ে বসে, তাহলে আমি কি করতে পারি?

লক্ষ্য করে দেখি, গৌতম অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। একটা চোরকাঁটা দিয়ে দাঁত খুঁটতে খুঁটতে অন্যদিকে চেয়ে বসে আছে!

বলি—কি ভাবছ বলত?

—একটা কথা সত্যি করে বলবে?

—বল না, কী কথা।

—কেন তুমি আজ এসেছ আমার কাছে? কী চাও তুমি সত্যি সত্যি?

ডায়েরি লিখতে বসে আমার মনে হচ্ছে—প্রশ্নটা কঠিন। অথচ কী তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে দিয়েছিলাম আমি। এখন নিজেকেই যদি ফের ঐ প্রশ্নটা করি তাহলে নিজেকে কি কৈফিয়ৎ দেব? কেন গিয়েছিলাম আমি গৌতমের কাছে? দুঃসাহসিকার মত! সে কি আমার অভিসার? ময়লা শাড়ি আর কাচের চুড়ি পরে একটি বেলা ওর সমতলে গিয়ে দাঁড়াবার সখ? যে জীবনকে পাইনি তাকে কয়েকটা খণ্ড মুহূর্ত ধরে উপভোগ করবার 'ভাইকেরিয়াস্' তীর্ষক আস্বাদন? এ কি আমার প্রাচুর্যের হাত থেকে সাময়িকভাবে পালাবার জন্য 'এস্কেপিজম্'? না কি সত্যিই গিয়েছিলাম গৌতমের

কাগজের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করতে ? আমি অলকের যেমন ক্ষতি করতে পারি না, তেমনি সজ্ঞানে গৌতমেরও ক্ষতি করতে পারি ? এত কথা তখন আমি ভাবিনি। মুখে মুখে তৈরী জবাব দিয়েছিলাম—সে তো আগেই বলেছি, টাকার জন্য !

হয়তো বিশ্বাস করল গৌতম, হয়তো করল না। বললে, বেশ তাই মেনে নিলুম ! কিন্তু আর নয়, এবার উঠতে হবে আমায় !

—আর একটু বস না।

—না, কাজ আছে। একজন লোকের আসার কথা আছে।

—গৌতম, প্লীজ !

তবু ও উঠে পড়ে। ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলে—তোমার এ কথাটা ঠিক আগের কথার সঙ্গে খাপ খেল না। তুমি এসেছিলে টাকার জন্য। টাকা তোমাকে দিয়েছি, আরও দেব। কিন্তু অহেতুক সময় নষ্ট করে কি হবে বল ?

মনে মনে হাসি। এ তাহলে অভিমান ! যাক্, ওর অভিমান ভাঙ্গাবার সুযোগ পরে পাব। আপাতত আমিও উঠে পড়ি। গৌতম বলে—আবার কবে আসছ ?

—কালই।

—না, কাল এস না। আমি থাকব না। তুমি বরং প্রুফটা ডাকে পাঠিয়ে দিও।

ও চলে যাবার উপক্রম করতে বললুম—আমার ঠিকানাটা তোমায় দিতে পারছি না, তবে এই ঠিকানায় চিঠি লিখলে আমি পাব। নমিতার ঠিকানা একটা কাগজে লিখে গুঁজে দিই ওর হাতে।

গৌতম চলে গেল। আশ্চর্য, একবারও পিছন ফিরে তাকালো না।

॥ পাঁচ ॥

এতদিনে নিঃসন্দেহ হয়েছি, এ ডেনমার্কে কোথাও কিছু একটা পচেছে। কিন্তু কোথায়? প্রথমে ভেবেছিলুম সেটা ফ্যাকটরিতে, পরে মনে হল, না—সেটা আমার মনের ভিতর। এখন মনে হচ্ছে তাও না—পচনক্রিয়া শুরু হয়েছে সুনন্দার মনে। আমাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে কুমুদ।

যদি নিজে চোখেই আগে দেখা না থাকত তাহলে বিশ্বাস করতে পারতুম না। হয়তো বন্ধু বিচ্ছেদ হয়ে যেত। তবু আমাকে বিস্ময়ের অভিনয় করতে হয়—তুমি ভুল দেখেছ কুমুদ! তাই কখনও হয়?

কুমুদ এ্যাসট্রেতে চুরুটের ছাইটা ঝাড়তে ঝাড়তে বললে—প্রথমটা আমিও তাই ভেবেছিলাম, কিন্তু নমিতা আমার কাছে স্বীকার করেছে!

—কী স্বীকার করেছে? ও বেশে সুনন্দা কোথায় যায়?

—কোথায় যায় তা সে জানে না—কিন্তু যায়।

—ওকেই জিজ্ঞাসা করব?

চম্‌কে ওঠে কুমুদ—পাগল! তাছাড়া নমিতা আমাকে বিশেষ করে বারণ করে দিয়েছে তোমাকে বলতে। তা সত্ত্বেও আমি বলতে বাধ্য হলুম। তোমাকে যে বলেছি, তাও নমিতার কাছে স্বীকার করব না আমি।

একটু চুপ করে থেকে বলি—তোমার কি মনে হয়?

কুমুদ বলে—আমার কি মনে হয় সে আলোচনা করার আগে বরং মিসেস্ মুখার্জি নমিতার কাছে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছেন সেটাই বলি—

—বল।

—মিসেস মুখার্জি নাকি তাঁর এক গরীব বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে যান।

—দ্যাটস্ এ্যাবসার্ড ! তাহলে আমার কাছে গোপন করবে কেন ?

—ঠিক তাই। ও কথা নমিতাও বিশ্বাস করেনি, আমিও না।

—তাহলে ?

—তাহলে স্টেটমেণ্টটাকে একটু সংশোধন করতে হয়। ঐ বান্ধবীর স্ত্রীয়'ম্ ঈপ্ টাকে বাদ দিতে হয়।

আমি চুপ করেই থাকি।

কুমুদই ফের বলে—দেখ অলক, আমরা যে সমাজে বাস করি তাতে এ নিয়ে হৈ চৈ করার কিছু নেই। আজ যদি আমি জানতে পারি নমিতা তার প্রাক্‌বিবাহ জীবনের কোন বন্ধুর সঙ্গে গোপনে দেখা করে তাহ'লে আমি সুইসাইড করব না। কিম্বা আজ যদি মিসেস্ মুখার্জি জানতে পারেন তুমি তোমার লেডী-স্টেনোকে নিয়ে একটু ফ্ূর্তি করেছ কোনও হোটেলে উঠে—

—লেডী স্টেনো ? মানে ? চমকে উঠি আমি।

—আহা, একটা কথার কথা। তোমার কনফিডেন্সিয়াল স্টেনো পুরুষ কি স্ত্রী তাই তো জানি না আমি। আমি বলছি, এসব আমাদের সমাজে এমন কিছু ভয়াবহ নয়। কিন্তু তবু বলব, ঐসব সাজ পোষাক বদলানো, ট্রামে বাসে যাওয়া, এসব ঠিক নয়। হয়তো এত কথা আমি বলতুমই না। কিন্তু ঘটনাচক্রে আমি জড়িয়ে পড়ায়—আই মীন মিসেস্ মুখার্জি আমার বাড়িটিকেই তাঁর সেণ্টার অব এ্যাক্‌টিভিটি করায় সব কথা বলতে হচ্ছে। পাছে তুমি না ভেবে বস আমরাও পার্টি-টু-ইট।

—কিন্তু আমি কি করি বলত ?

—তোমাকে দুটি পরামর্শ দিতে পারি আমি। একটা সর্ট টার্ম, একটা লং টার্ম।

—বল।

—ইম্মিডিয়েট স্টেপ হিসাবে আমি বলব, সব কাজ কর্ম ছেড়ে দিয়ে মাস দু-তিন কোথা থেকে ঘুরে এস সস্ত্রীক।

কথাটা মনে লাগে। বলি—ঠিক বলেছ! অগস্টিনের একটা কথা আছে—'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ এ গ্রেট্ বুক, অব হুইচ দে হু নেভার স্টার্ ফ্রম হোম রীড ও'নলি এ পেজ!'

আমার কথায় কান না দিয়ে কুমুদ বলে—আর আমার লংটার্ম সাজেসন হচ্ছে, বছর খানেকের মধ্যেই তুমি কোন একটা মেটার্নিটি হোমে একটা কেবিন ভাড়া কর।

অবাক হয়ে বলি—তার মানে?

—তার মানে, ফর হেভেনস্ সেক্, স্টপ্ দিস্ ফ্যামিলি প্ল্যানিং নুইসেন্স!

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলি—দুটোই দামী কথা বলেছ তুমি। এই বিশ্বকর্মা পুজো আর স্ট্রাইকের হাঙ্গামাটা মিটে গেলেই একটা লম্বা ছুটিতে বেরিয়ে পড়ব। এখানে জীবন বড় একঘেয়ে হয়ে উঠেছে। আর, আর—ও কথাও ঠিক বলেছ। বাড়িতে ছেলেপিলে ছাড়া আর মানাচ্ছে না। হয়তো একটা বাচ্চা কোলে এলে এসব খেয়াল ঘাড় থেকে নামবে। সাউদে ঠিকই বলেছেন—'কল নট্ দ্যাট ম্যান রেচেড, হু, হোয়াটেভার ইল্স্ হি সাফার্স, হ্যাজ এ চাইল্ড টু লাভ।'

কুমুদ আমাকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়ে বলে—আমার আর একটি সাজেসন আছে বন্ধু; এ্যাণ্ড দ্যাটস্ এ রীয়াল পীস অব্ এ্যাডভাইস্।

—বল!

—স্টপ্ প্লেয়িং দ্যাট অ'ফুল গেম অব কোটেশান্স! ঐ কোটেশানের ভূত তোমার ঘাড় থেকে না নামলে, আমি বলে দিচ্ছি তোমাকে, একদিন ডাইভোর্স মামলার কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে।

আমি জবাব দিই নি। কুমুদের লেখাপড়া কম। টাকা আছে

অগাধ—পৈত্রিক সম্পত্তি ; কিন্তু পেটে নেই বিদ্যে। বায়রনের ভাষায় ওর হচ্ছে 'জাস্ট এনাফ অব লার্নিং টু মিস-কোট।' ও এ খেলার মর্ম কী বুঝবে ? জুতসই একটা উদ্ধৃতি দিতে পারা একটা বড় আর্ট। বেইলি বলেছেন, 'দেয়ার ইজ নো লেস ইনভেন্সান ইন এ্যাপ্টলি এ্যাপ্লাইং এ থট ফাউণ্ড ইন এ বুক, দ্যান ইন বিইং দ্য ফার্স্ট অথার অব দ্য থট !' কুমুদ তার মর্ম কী বুঝবে ?

কুমুদ না বুঝুক, পর্ণা বোঝে। কথার পিঠে চমৎকার কথা সাজাতে পারে সে। মোহিত করে দেয় একেবারে।

কিন্তু !

নিজের মনকে আজ জিজ্ঞাসা করবার সময় এসেছে—আমি কোথায় যাচ্ছি ? এ কী ভীষণ খেলায় মেতে উঠেছি আমি ! মনকে চোখ ঠাউরেছিলুম, কিন্তু মনের অগোচরে যে পাপ নেই। আমি কি জড়িয়ে পড়ছি ? পড়েছি ? এতদূর এগিয়ে গেলুম কিসের টানে ? এগিয়ে যেতে দিলুম ওকে ? যন্ত্র হিসাবে যাকে ব্যবহার করব মনে করেছিলুম—সে তো যন্ত্র নয়। সে যে রক্তমাংসে গড়া একটা মানুষ। তারও যে একটা সত্ত্বা আছে। শুধু তারই বা কেন, আমারও যে একটা সত্ত্বা আছে। আমার মনের একটা কোণা কি এতদিন খালি ছিল—যা ভরিয়ে তুলতে পারেনি সুনন্দা ? কথাটা ভাবতেও বুকে বাজে। কিন্তু কথাটা বোধহয় সত্যি। না হলে এতটা অভিভূত আমাকে করতে পারতো না ঐ এক ফোঁটা একটা কালো মেয়ে। সে ধরা দিল না, অথচ ধরে রাখলো আমাকে।

আর নয়। এবার সাবধান হতে হবে। না হলে তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়বে আমার এ সুখের নীড়। ঠিকই বলে নন্দা—ও মেয়ে বিষকন্যা। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেবে একেবারে। অথচ কী আশ্চর্য ! সব জেনে সব বুঝেও আমি কিছুতেই সাবধান হতে পারি না, সংযত হতে পারি না।

এবার নন্দার ব্যাপারটায় চোখ খুলে গেছে আমার। লম্বা ছুটি

নিয়ে বেরিয়ে পড়ব যেদিকে দুচোখ যায়। ধর্মঘটের এ হাঙ্গামাটা মিটলেই আমার ছুটি। কারখানা থেকে ছুটি, দুশ্চিন্তা থেকে ছুটি, আর ছুটি ঐ মেয়েটির নাগপাশ থেকে। ছুটিতে যাবার আগে মেয়েটিকে বরখাস্ত করে যেতে হবে। ও মেয়ে সব পারে! যে আমার কাছে টাকা খেয়ে শ্রমিকদের গোপন সংবাদ সংগ্রহ করে আনতে পারে, সে আর কারও কাছে টাকা খেয়ে আমার সর্বনাশও করতে পারে। আর কিছু না পারুক আমাকে ব্ল্যাকমেইলও তো করতে পারে।

কিন্তু না, এ আমি অন্যায় করছি। পর্ণা সে জাতীয় মেয়ে নয়। তাকে বিশ্বাস করেছি আমি। অফিসের অনেক গোপন খবর আজ সে জানে। আমিই জানিয়েছি। নির্ভয়ে জানিয়েছি। দুটি কারণে সে আমার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারবে না। প্রথমত সে শ্রমিকদের কাছে আমার গোপন কথা বলতে পারবে না। কারণ সে যে ওদের গোপন সংবাদ আমাকে সরবরাহ করেছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার কাছে আছে। সে কথা আমি ওদের জানালে এ অফিসে তাকে চাকরি করতে হবে না। শ্রমিকেরাই তাকে কেটে ভাসিয়ে দেবে গঙ্গায়। বিশ্বাসঘাতকের স্থান নেই শ্রমিক যুনিয়ানে। দ্বিতীয়ত আমি পর্ণার প্রেমে না পড়লেও সে নিঃসন্দেহে আমার প্রেমে পড়েছে। যৌবনের মাঝামাঝি এলেও সে অনূঢ়া। বাঙ্গালী মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। আমার মত ছেলে ওর কাছে স্বপ্নকথা। রূপকথার রাজপুত্র। ও জানে আমি বিবাহিত—তা হোক, তবু পুরুষের সঙ্গ, পুরুষের কাছ থেকে ফ্ল্যাটারি শুনবার জন্যেও যে ঐ অতিক্রান্ত-যৌবনা মেয়েটি আজ লালায়িত। অগাধ সম্পত্তির মালিক, রাজপুত্রের মত চেহারার একটি ছেলে যদি ঐ আকৈশোর উপেক্ষিতার কানে নিত্য গুঞ্জরণ করে যায়, তাহ'লে তার পক্ষে বিশ্বাসঘাতকতা করার অবকাশ কোথায়? পর্ণাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা যাবে না। নিজের স্বার্থেই আটকে রাখতে হবে ওকে।

॥ ছয় ॥

পরশু উৎসব। ভাদ্রের ভরাগঙ্গায় শেষ দিনটির জোয়ার আসতে আর তিন দিন বাকি। কাল থেকে ও বাড়ি ফেরেনি। যা আশঙ্কা করেছিলাম। শ্রমিক-মহলের ধূমায়িত অসন্তোষ হঠাৎ বিস্ফোরণের রূপ নিয়েছে। বেআইনী কাজ করেছে ওরা। মরবে ওরাই। বিনা নোটিশে ধর্মঘট শুরু করেছে হঠাৎ। শেষ সাবধানবাণী অগ্রাহ্য করেছে অলক। তা তো করবেই। ধর্মঘট আজ তিন দিনের শিশু।

কালও কোনরকমে কাজ চলেছিল। আজ নাকি বয়লারে আগুন পড়েনি। রামলালের কাছে যা শুনলাম তা ভয়াবহ ব্যাপার। সমস্ত দিন স্তব্ধ গাম্ভীর্যে কারখানাটা যেন অপেক্ষা করে আছে—কালবৈশাখীর পূর্বাহ্ণে যেন বিশাল বনস্পতির মৌনতা।

কাল থেকে অলক বাড়ি ফেরেনি। কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারছি না। যত কাজই থাক, রাতটা সে বাড়িতেই কাটায়। কাল গেছে একটা ব্যতিক্রম। টিফিন ক্যারিয়ারে করে অফিসেই খাবার পৌঁছে দিয়ে এসেছে রামলাল। রাত্রে কেন ফিরল না বুঝতে পারছি না। সারাটা রাত কী এমন কাজ থাকতে পারে? আজ সমস্ত দিনে পাঁচবার টেলিফোন করেছি। প্রতিবারেই শুনতে হয়েছে—বড়সাহেব অফিসে নেই। অফিসে নেই তো কোথায় আছেন? সন্ধ্যাবেলায় আবার একবার ফোন করলাম—সেই একই জবাব—'সরি, মিস্টার মুখার্জি এখন অফিসে নেই।'

—'কোথায় আছেন তিনি?'

—'বলতে পারছি না।'

বিরক্ত হয়ে বলি—'আপনি কে কথা বলছেন?'

যেন প্রতিধ্বনি হল—'আপনি কে কথা বলছেন?'

ধমক দিয়ে উঠি—'আমি মিসেস্ মুখার্জি, আপনি কে ?'

ধীরে ধীরে ওপাশ থেকে ভেসে এল—'আপনি আমাকে চিনবেন না, আমি মিস্টার মুখার্জির স্টেনো। মিস্টার মুখার্জিকে এখন পাবেন না।'

কানে যেন কে সীসে ঢেলে দিল। টেলিফোনের এক প্রান্তে সুনন্দা মুখার্জি, অপর প্রান্তে পর্ণা রায়! মনে হল, ও যেন বলতে চায় অলককে আমি পাব কি না পাব তা নির্ভর করছে ওর মর্জির উপর। আমি যেন একটা ভিক্ষা চাইছিলাম ওর কাছে—সেটাই প্রত্যাখ্যান করছে ও, স্পষ্ট ভাষায় বলছে—'মিস্টার মুখার্জিকে এখন পাবেন না।' মনে হল কথাটার মধ্যে প্রচণ্ড বিদ্রূপ আছে—কণ্ঠস্বর অনুসারে যেন ভাষাটা হওয়া উচিত ছিল—'মিস্টার মুখার্জি কি আমার বাঁধা গরু, যে আঁচল খুলে দিলেই আপনার খোঁয়াড়ে গিয়ে ঢুকবে ?'

ভীষণ একটা কড়া জবাব দিতে গেলাম। কী স্পর্ধা মেয়েটার, লাইন কেটে দিয়েছে!

সমস্ত সন্ধ্যাটা ছটফট করতে থাকি। সময় যেন আর কাটে না। সন্ধ্যার ডাকে এল একখানা চিঠি। হাতের লেখা অপরিচিত। ইচ্ছে করছে না খুলতে। মাথা ধরেছে আজ। কিন্তু হাতেও কোন কাজ নেই। গল্পের বই পড়তেও ইচ্ছে করছে না। শেষপর্যন্ত খুলেই ফেললাম চিঠিখানা। আদ্যন্ত পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম! চিঠি লিখছে গৌতম। লিখেছে :

"তোমার পাঠানো প্রুফ পেলাম। বলেছিলে, আবার একদিন আসবে। এলে না। ভালই করেছ। যে কথা আজ চিঠিতে লিখছি তা বোধহয় তোমার মুখের উপর বলতে পারতুম না। তুমি বোধহয় খুব অবাক হয়ে গেছ আমার চিঠি পেয়ে, নয় ? কিন্তু অবাক হওয়ার কিছু নেই। তুমি জানতে না যে আমি জানতুম—তোমার বর্তমান ঠিকানা। তোমার পরিচয়। অনেক দিনই জানি!

"সেদিন তোমাকে দেখে আমি যে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলুম — তার কারণ শুধু এই। আমি ভাবছিলুম—ক্যাপিটালিস্ট অলক মুখার্জির স্ত্রী এ-বেশে, এ-ভাবে কেন এসেছেন আমার দ্বারে!

"বারে বারে তা আমি জানতে চেয়েছিলুম। বারে বারে তুমি মিছে কথা বলেছিলে।

"আমি তখন ভাবছিলুম—তোমার এই অদ্ভুত আচরণের দুটো ব্যাখ্যা হতে পারে। প্রথমত, তুমি এসেছিলে অলকবাবুর স্বার্থে। হয়তো তাঁরই নির্দেশে। এসেছিলে জানতে আমাদের কাগজের কথা। আমাদের আগেকার একটি সংখ্যার গ্যালি প্রুফ চুরি যায়। তাতে তোমার স্বামীর প্রভূত সুবিধা হয়েছিল। সেই জন্যই তোমাকে পাঠানো হয়েছে। বিশ্বাস কর সু, (এ নামে এই শেষ বার সম্বোধন করলুম তোমাকে, মাপ কর আমাকে) এ কথা মনে করতে সেদিন রীতিমতো কষ্ট হয়েছে আমার। যে মেয়েটির সঙ্গে এক সঙ্গে রাত জেগে পোস্টার লিখতুম কলেজ জীবনে, স্বপ্ন দেখতুম পুঁজিবাদীদের শোষণের বিরুদ্ধে কাগজ বার করব বলে—সেই মেয়েটিই আসবে বন্ধুর বেশে বিশ্বাসঘাতকতা করতে—এটা ভাবতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল আমার। তোমার স্বামী এবং আমি আজ ঘটনাচক্রে বিপক্ষ শিবিরে; তবু আমি ভাবতেই পারি না, তুমি আমার স্বার্থে তোমার স্বামীর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পার, অথবা তাঁর স্বার্থে আমার সঙ্গে। তাই কিছুতেই ও কথাটা মেনে নিতে পারিনি।

"সেদিন আমার স্ত্রীর কথা আলোচনা করিনি, আজ করেছি। ঘটনাটা সমস্ত খুলে বলেছি আমার স্ত্রীকে। তাঁর বিশ্বাস, তুমি এসেছিলে শুধু ঐ কারণেই। শাঁখা সিঁদুর সম্বল করে তুমি গুপ্তচরের বৃত্তিতে নেমেছিলে!

"দেখ, স্পাই কথাটা শুনলেই কেমন যেন লাগে। তবু একটা আদর্শের জন্য, একটা নিঃস্বার্থ দশের মঙ্গলের জন্য যখন মানুষ এই

আপাত ঘৃণ্য বৃত্তিতে নামে তখন তাকে ঘৃণা করা যায় না। স্বাধীনত সংগ্রামে শত শহীদদের আমরা স্মরণ করি, কিন্তু আমি একটি মেয়েকে জানি যে, বিপ্লবীদের পালিয়ে যাবার সুযোগ দিতে স্বেচ্ছায় আত্মদান করেছিল দারোগাবাবুর কাছে। একরাত আটকে রেখেছিল সেই নারীমাংস-লোলুপ পশুটাকে। স্বাধীনতার পরে যারা জেলে আটক ছিল তারা গদী পেল, পারমিট পেল, চাকরি পেল—পেল খেতাব আর সম্মান; কিন্তু ঐ একটি রাত যে হতভাগী দারোগাবাবুর ঘরে আটক ছিল সে ঘর পেল না, বর পেল না—মা ডাক শুনল না জীবনে। তাকে ঘৃণা করি এতবড় নীতিবাগীশ আমি নই!

"কিন্তু আমার আশঙ্কা যদি সত্য হয়, তাহলে তোমাকে তো সে সম্মান দেওয়া যাবে না সু। তাই আজও বিশ্বাস করতে পারছি না— সেদিন তুমি এসেছিলে আমাকে ব্ল্যাকমেইল করবার সদিচ্ছা নিয়ে।

"আর একটি সমাধান হতে পারে এ সমস্যার। তুমি সেদিন মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে ছুটে এসেছিলে আমার কাছে অন্য এক প্রেরণায়। সেটা সামাজিক কারণে অন্যায় কি না জানি না। তবু হাজার বছরের কাব্য সাহিত্য আমাদের শিখিয়েছে একে ক্ষমা করতে। প্রেম এমন একটা জিনিস যাতে অমার্জনীয় অপরাধেরও ধার ক্ষয়ে যায়। বিশ্বাস কর সু, আমি বিশ্বাস করেছিলুম—তুমি তারই প্রেরণায় ছুটে এসেছিলে আমার কাছে,—তোমার স্বামীকে লুকিয়ে, তোমার পরিচয় গোপন করে।

"কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার। সে বিশ্বাসটুকু তুমি আমাকে আঁকড়ে থাকতে দিলে না। তুমি দ্বিতীয়বার এলে না আমার সেই ভাঙা অফিস ঘরে। ডাকের সাহায্যে শুধু আমার কাগজের প্রশ্ন পাওয়াতেই তোমার আগ্রহ দেখলুম। তাই এই চিঠি।

"সেদিন তুমি প্রশ্ন করেছিলে, আমার বউ পছন্দ হয়েছে কিনা। তখন জবাব দিইনি, এখন দিচ্ছি। হ্যাঁ, দাম্পত্যজীবনে আমি পুরোপুরি সুখী। তোমার সব কথা তাকে খুলে বললুম, এ চিঠি

দেখিয়েছি তাকে। তুমিও ইচ্ছে করলে অলকবাবুকে আমার চিঠি দেখাতে পার।

"ঈশ্বর তোমাকে শান্তি ও সুমতি দিন। ইতি—"

অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে মাথায়। ইচ্ছা করছে কাচের ডিনার সেটটা আছড়ে আছড়ে ভাঙ্গি! হেরে গেছি, একেবারে নিঃশেষে হেরে গেছি। এরপর আর লোকসমাজে মুখ দেখাবো কেমন করে? লোকসমাজে কেন—আয়নার সামনে দাঁড়াবো আর কোন্ লজ্জায়? ঘরে-বাইরে দাঁড়াবার যে একটুখানি ঠাঁইও আমার রইল না। এমন অবস্থাতে পড়লেই কি মানুষ আত্মহত্যা করে বসে?

না। আত্মহত্যা আমি করব না। কিছুই খোয়া যায় নি আমার। অলককে বলব, লম্বা ছুটি নাও। চল, আমরা দুজনে কিছুদিনের জন্যে কোথা থেকেও বেড়িয়ে আসি। পর্ণার নাগপাশ থেকে ওকে উদ্ধার করতে হবে। পর্ণাকে তাড়াতে হবে ওর অফিস থেকে, ওর জীবন থেকে। কিন্তু!

পর্ণাকে ওর জীবন থেকে তাড়াতে পারলেই কি সব সমস্যার সমাধান হ'ল? আজ যে আমি ঐ সঙ্গে নিজেকেও দেখতে পাচ্ছি। সুন্দরী স্ত্রীর একান্ত প্রণয় উপেক্ষা করে অলক যদি মরীচিকার পিছনে ছুটে থাকে তো তাকে দোষ দেব কেমন করে? আমিও তো ঐ পাপে পাপী! আমিও গৌতমের প্রেসে গিয়ে হাজির হয়েছিলুম ঐ একই প্রেরণায়। আমার মনে হয়েছিল, অলক যে সুনন্দার প্রেমে মুগ্ধ হয়েছে সে সুনন্দা আমার আমি নয়—সে একটা রক্তমাংস চামড়ায় গড়া পুতুল। সে পুতুলটাকে আমি চিনিমাত্র। সে আমি নই। সে পুতুলটা সাজতে ভালবাসে, সাজাতে ভালবাসে, রোজ সন্ধ্যাবেলায় মাথায় গোলাপ ফুল গুঁজে সে কফির পেয়ালা হাতে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়ায়। জ'লো প্রেম করে। সে কেক বানায়, উল বোনে, সামাজিক পার্টি ডিনারে হাজিরা দেয়, অলক মুখার্জির স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করে। কিন্তু সে তো পুরোপুরি আমি নই।

আমার মধ্যে যে সত্যিকার নারীসত্বাটা আছে তাকে তো অলক মুখার্জি কোনদিন ঘোমটা খুলে দেখবার চেষ্টা করেনি। সে-আমি যে প্রেমের ভরা বন্যায় নিঃসম্বল যাত্রায় প্রেমিকের হাত ধরে যাত্রা করতে রাজী; সে-আমি যে দয়িতের জন্য সব কৃচ্ছ্রসাধন হাসি মুখে স্বীকার করতে উন্মুখ। অলক মুখার্জি তো সে-আমিকে চিনবার চেষ্টা করেনি,—সে সুযোগও পায়নি সে। আমার সেই সত্বাই আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল ঐ গৌতমের ছাপখানার অফিসে। হ্যাঁ, আজ স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার তখন মনে হয়েছিল, পারলে ঐ গৌতমই পারবে আমার সে প্রেমের মর্যাদা মিটিয়ে দিতে। ঠিকই ধরেছে সে। আমি বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাইনি তার দ্বারে। আমি গিয়েছিলুম সেই প্রেরণায় যে প্রেরণাতে শ্রীরাধিকা ঘর ছেড়ে ছিলেন! কিন্তু সে কথা কোনদিন জানতে পারবে না গৌতম; আমি নিজের কাছেও সে কথাটা এই মুহূর্তের আগে স্বীকার করিনি।

গৌতম লিখেছে, দাম্পত্য জীবনে সে সুখী! কেন লিখেছে? সেটা তো মিছে কথা। আমাকে আঘাত দেবার জন্যই লিখেছে। ভেবেছে, সে সুখী, একথা শুনলে আমি ঈর্ষায় জ্বলে পুড়ে মরব। কারণ তার বিশ্বাস, আমি তার কাছে গিয়েছিলাম শুধু বিশ্বাস-ঘাতকতা করতে। তার প্রতি ভালবাসার টানে নয়। এও তোমার ভুল, গৌতম। সে ভুল ভেঙ্গে দেবার সুযোগও আমার আছে। কিন্তু তা আমি দেব না। তুমি সুখীই থাক। তোমার সুখেই আমার সুখ! উঃ! মাথার যন্ত্রণাটা আবার বাড়ছে।

চাকরটা এসে খবর দিল শম্ভুচরণবাবু এসেছেন।

শম্ভুবাবু আমার শ্বশুরের আমলের মানুষ। কারখানায় অলকের ডানহাত। শুনেছি আমার শ্বশুর যখন ফাঁকা মাঠের মাঝখানে এই কারখানা খুলবার স্বপ্ন দেখেন তখন সকলে তাঁকে বারণ করেছিল। এই শম্ভুচরণ তখন তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বন্ধু ছিলেন দুজনে। তারপর অবশ্য শম্ভুচরণ বন্ধুর অধীনেই কাজ নেন।

সেই অবধি তিনি রয়ে গেছেন এ কারবারে। অলক অত্যন্ত শ্রদ্ধা করে তাঁকে। কর্মচারী হলেও তিনি যে পিতৃবন্ধু এ কথাটা আমার স্বামী ভুলতে পারে না। প্রতি বছরই বিশ্বকর্মা পূজার দিন তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি এভাবে বাড়িতে এসেছেন বলে মনে পড়ে না তো।

নেমে এলাম বাইরের ঘরে।

আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন শম্ভুবাবু। আমি তাড়াতাড়ি তাঁর সম্মুখের সোফাটায় বসে বলি—কি খবর শম্ভুকাকা, হঠাৎ এত রাতে?

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বলেন—মায়ের বিশ্রামের কি ব্যাঘাত ঘটালুম?

আমি বলি—মোটেই না; কিন্তু জরুরী খবর আছে মনে হচ্ছে।

—তা আছে। কিন্তু তার আগে একটা কথা মা। আমাদের কথাবার্তা কি আর কেউ শুনতে পাচ্ছে?

আমি উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এলুম। তাঁর কাছে ফিরে এসে বসি; বলি—এবার বলুন।

বৃদ্ধ টাকের উপর হাত বুলিয়ে আমতা আমতা করে বলেন—তোমাকে সবকথা খুলে বলব বলেই এসেছি মা।—কিন্তু স্বীকার করছি—সঙ্কোচও হচ্ছে একটু। তুমি কিছু মনে করবে না তো?

আমি বলি—মনে করার মত কথা না বললে, মনে করব কেন?

—কিন্তু মনে করার মত কথাই যে বলব আমি, মা।

—তা হলেও বলুন।

আবার একটু ইতস্তত করে বলেন—আমার বরখাস্ত হয়ে গেছে, শুনেছ বোধকরি।

চমকে উঠি আমি। বলি—কই, না?

—অলক তাহলে তোমাকেও কিছু বলেনি দেখছি।

—না। কিন্তু হঠাৎ আপনাকে বরখাস্ত করার কারণ?

—সেটাই বলতে এসেছি। সঙ্কোচও সেইজন্য। প্রথমত, এ

কথা ঠিক, এ বৃদ্ধ বয়সে আমার পক্ষে বিকল্প চাকরি যোগাড় করা অসম্ভব। সংসারে তোমার কাকিমা ছাড়াও আমার একটি বিধবা মেয়ে আছে। তাদের কেমন ভাবে খাওয়াব পরাব জানি না।

বুঝতে পারি, সেইজন্য দরবার করতে এসেছেন উনি। এসব ক্ষেত্রে সচরাচর আমি নাক গলাই না—জানি, আমার স্বামী কখনও কোন অন্যায় করেন না। এক্ষেত্রেও না জেনেও আমি স্থির নিশ্চয়—নিশ্চিত শম্ভুচরণবাবু এমন কোন অপরাধ করেছিলেন যার ক্ষমা নেই। নাহলে কারখানার শৈশবাবস্থা থেকে যে কর্মচারী এর সঙ্গে যুক্ত, যে ওর পিতৃবন্ধু, যার চাকরি যাওয়া মানে একটি পরিবারের নিশ্চিত অনশন মৃত্যু—তাকে এভাবে পদচ্যুত করত না অলক। সে জাতের মানুষ নয় আমার স্বামী।

বৃদ্ধও সেই কথাই বললেন। বলেন—তোমার জানার কথা নয় মা, তোমার শ্বশুর জানতেন সে সব কথা। অলক তখন বিলাতে। লেখাপড়া করছে। তোমার শাশুড়ী ঠাকরুণ মারা গেলেন। তখন বিশ্বজুড়ে যুদ্ধ চলছে—অলক আসতে পারল না। আমাকেই সব কাজ করতে হল। অলকের বাবা শুধু আমার অন্নদাতাই ছিলেন না—তিনি ছিলেন আমার বন্ধু। স্ত্রী-বিয়োগের পর তিনি বোধহয় মাসছয়েক কারখানায় বার হননি। চাবিকাঠি পর্যন্ত ধরে দিয়েছিলেন এই বুড়োর হাতে। আমি পরলোকে বিশ্বাস করি মা;—আমি জানি, উপর থেকে তিনি দেখেছেন আমি নিহকহারামী করেছি কিনা!

কোঁচার খুঁট দিয়ে চোখটা মোছেন উনি।

বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কিন্তু আপনাকে বরখাস্ত করার কারণ তো কিছু একটা আছে?

গলাটা সাফ করে নিয়ে তিনি বলেন—তা আছে। আমাকে অলক আর বিশ্বাস করে না। আমি নাকি বিশ্বাসঘাতক।

আমাকে চুপ করে থাকতে হয়।

বৃদ্ধ আপন মনেই বলতে থাকেন—কারখানার কিছু গোপন খবর

বাইরে বেরিয়ে গেছে। সব কথা তোমাকেও বলতে পারব না আমি। কিন্তু সে সব খবর অলক আর আমি ছাড়া আর কেউ জানে না। জানার কথা নয়। তাই ও মনে করে—

মাঝপথেই থেমে পড়েন উনি।

আমি পাদপূরণ করে দিই—সেটা কি অস্বাভাবিক? আপনিই বলুন?

বৃদ্ধ চোখ দুটি আমার মুখের উপর তুলে বলেন—হ্যাঁ অস্বাভাবিক! এতে আর্থিক ক্ষতি অবশ্য আমার নয়, অলকের। কিন্তু এতে অলক যতটা আঘাত পেয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী পেয়েছি আমি! এ যে আমার নিজে হাতে গড়া কারখানা, মা।

আমি বললাম—কিন্তু, আপনি তো নিজেই বলছেন যে, আপনারা দুজন ছাড়া সে সব খবর আর কেউ জানত না। দ্বিতীয়ত, আপনাদের শত্রুপক্ষ নিশ্চয়ই এ খবরগুলো উচ্চমূল্যে সংগ্রহ করতে রাজী, নয় কি?

—তা তো বটেই!

—তবে আর অলককে কি দোষ দেব? সে তো ঠিকই করেছে। আমি তো আপনার হয়ে কোন সুপারিশ করতে পারব না।

বৃদ্ধ একটু সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করেন—তুমি আমায় ভুল বুঝেছ মা। আমি তোমার কাছে দরবার করতে আসিনি। তুমি আমার হয়ে সুপারিশ কর, এ কথা বলতেও আমি আসিনি—

আমি বললুম—তবে কি বিদায় নিতে এসেছেন?

বৃদ্ধ বলেন—হ্যাঁ, তা বলতে পার। যাবার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যেতে হবে বৈ কি। কিন্তু শুধু সে জন্যও আসি নি। তোমাদের ছেড়ে চলে যাবার আগে তোমাকে বিশেষ করে কয়েকটি কথা বলে যাওয়া প্রয়োজন মনে করছি আমি। না হলে তোমার শ্বশুর, আমার সেই অন্নদাতা বন্ধুর কাছে আমার অপরাধ হবে।

আমি চুপ করে বসে থাকি।

বৃদ্ধ বল্লেন—দেশে আমার সামান্য জমি আছে। সেখানেই গিয়ে উঠব। কোম্পানির দেওয়া বাড়ি আমাকে আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ছেড়ে দিতে হবে। দেশের বাড়িতে গুটিকয়েক ছেলেকে পড়াব স্থির করেছি। মনে হয়, কোন রকমে ভদ্রভাবে দিন কেটে যাবে আমার। শেষদিনের বড় বেশী বাকিও তো নেই।

তারপর আমার বিরক্ত মুখের দিকে চেয়ে বল্লেন—বুঝেছি মা, এসব কথা তোমার ভাল লাগছে না। তবে ও কথা থাক। কিন্তু যে কথা না বলে যেতে পারছি না, সেটা যে বলাই চাই।

—বলুন।

—অলকের নূতন স্টোনোটি কি তোমার বান্ধবী?

আমি অবাক হয়ে যাই। এ কথা শম্ভুবাবু কেমন করে জানলেন! একটু বিস্ময়ের অভিনয় করে বলি—কার কথা বলছেন আপনি?

—অলকের নূতন স্টোনো—পর্ণা রায় কি তোমার সহপাঠিনী?

বুঝতে পারি, অস্বীকার করাটা বোকামি হবে, তাই বলতে হল—হ্যাঁ, কিন্তু আপনি কেমন করে জানলেন?

—আমাকে সব কথা জানতে হয় মা। না হলে এতবড় কারখানায় কোথায় কি হচ্ছে কেমন করে খবর রাখব বল? তা মেয়েটির সম্বন্ধে তুমি কতদূর কি জান, বলত।

—কতদূর কি জানি মানে?

—ওর স্বভাব চরিত্র সম্বন্ধে, ওর জীবনের সম্বন্ধে?

—বিশেষ কিছুই জানি না। কিন্তু এসব প্রশ্ন কেন করছেন আপনি?

—করছি, কারণ করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। তোমার শ্বশুর আজ উপস্থিত থাকলে তিনিই এ প্রশ্ন করতেন।

আমি একটু রুক্ষ স্বরে বলি—কিন্তু আমার শ্বশুরকে যে জবাব আমি দিতাম, তা—

আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে উনি বলে ওঠেন—'তা আমার

স্বামীর বরখাস্ত করা কর্মচারীকে আমি দিতে বাধ্য নই,' এই তো ?

আমি চুপ করে থাকি। অপমানে ওঁর মুখ চোখ লাল হয়ে ওঠে। বলেন—আমারই ভুল মা, আমারই ভুল। তোমার কাকিমাও বারণ করেছিলেন। বলছিলেন, চাকরিই যখন রইল না, তখন এসব কথার মধ্যে আমাদের না থাকাই ভাল। বেশ তোমার ভালমন্দ তুমিই বুঝে নিও। আমি বরং চলি—

উঠে দাঁড়ান উনি।

আমি একটু ইতস্তত করে বলি—উনি কি আজ আসবেন না ?

লাঠিখানা তুলে নিতে নিতে উনি বলেন—বোধহয় না। এলে আর কেন গাড়ি পাঠিয়ে পর্ণাকে নিয়ে যাবেন ?

—কে নিয়ে গেল ? কোথায় ?

বৃদ্ধ যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন, বলেন—এইমাত্র আসানসোল থেকে গাড়ি এসেছিল—ওঁর স্টেনোকে নিয়ে আবার গাড়ি সেখানে ফিরে গেল।

আমি সচকিত হয়ে বলি—সে কি ! কেন ?

—সে কথাই তো আলোচন করতে এসেছিলুম মা ; কিন্তু তুমি দেখছি এ বরখাস্ত করা কর্মচারীকে বরদাস্ত করতে নারাজ !

গরজ বড় বালাই ! ওঁকে জোর করে বসিয়ে দিয়ে বলি—আপনি অহেতুক আমার উপর রাগ করছেন। আমি যে সব কথা বলিনি তাই আমার মুখে বসিয়ে খামখা আমাকে দোষরোপ করছেন। কি হয়েছে আমাকে খুলে বলুন কাকাবাবু। আমিও দেখি আপনার জন্য কিছু করা যায় কিনা।

আবার বসে পড়েন বৃদ্ধ। বলেন—না, আমার জন্য কিছু আর করার নেই। সে অনুরোধও আমি করব না। কিন্তু তুমি এবার নিজে ঘর সামলাও মা। আমার ঘর ভেঙেছে, তা ভাঙুক—আমার জীবনের বাকিই বা কি আছে ? কিন্তু তোমাকে যে অনেকটা পথ এখনও চলতে হবে !

বুকের মধ্যে দুর দুর করে ওঠে। বলি—কেন, আপনি কি তেমন কিছু আশঙ্কা করেছেন?

—তা করছি। সে সব কথা বলতে আমার সঙ্কোচ হত না। আজ তোমার মনে হতে পারে, আমি বুঝি প্রতিশোধ নিতেই কতকগুলো মিছে কথা বানিয়ে বলে যাচ্ছি—

—না না না। আমি তা মনে করব না। আপনি বলুন। সব কথা আমাকে খুলে বলুন। উনি কি পর্ণাকে নিয়ে—

—হ্যাঁ তাই। সন্দেহটা আমার অনেকদিনই হয়েছিল। কানাঘুষা অনেক কিছুই শুনেছি। বিশ্বাস করিনি; বিশ্বাস করতে মন চায় নি। কিন্তু মনে হচ্ছে ওরা দুজনেই ক্রমশ বেপরোয়া হয়ে পড়ছে। আশ্চর্য! যার ঘরে এমন সতীলক্ষ্মী বউ—

লজ্জায় মাথা কাটা গেল আমার। কিন্তু ও বৃদ্ধের কাছে আর লজ্জা করে কি হবে? বলি—কেমন করে এমন হল কাকাবাবু?

—কেমন করে হল তা বলা বড় শক্ত মা। বোধকরি পুরুষ মানুষের ধর্মই এই। যা হাতের কাছে অনায়াসে পাওয়া যায় তাতে তার তৃপ্তি নেই। তা বড়লোকের সমাজে এটা তেমন কিছু নয়, আমিও এটাকে অতটা গুরুত্ব দিতুম না; দিতে হচ্ছে অন্য কারণে। এ মেয়েটির সম্বন্ধে যা শুনেছি তাতে আমার ভয় হয়েছে এ শুধু তোমার ঘরেই নয়; তোমাদের কারখানাতেও আগুন জ্বালাবে! একটি গোপন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে ওর যোগাযোগ আছে। অলককে সে কথাই বলতে গেলুম—কিন্তু সে যেন নেশার ঝোঁকে আছে। আমার কথায় কান তো দিলেই না, অহেতুক অপমান করে বসল আমাকে।

আমি বলি—আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

—অসম্ভব কিছুই করতে বলি না। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ গৃহস্থ বধূ যা করে থাকে তাই করবে। অলককে সরিয়ে নিতে হবে পর্ণার সান্নিধ্য থেকে। ও মেয়েটি সর্বনাশা, ওকে তাড়াতে হবে।

আবার বলি—কিন্তু আপনি যদি আমাদের ছেড়ে যান, তাহলে কেমন করে আমি তা পারব বলুন? আপনাকে তো যেতে দেওয়া যাবে না।

—কিন্তু রাখবে কেমন করে মা? সে সব বরং থাক। আপাতত আমি যাই। যে অলক্ষ্মী ওর উপর ভর করেছে, ঘাড় থেকে সে অলক্ষ্মী নামলে ওর শুভবুদ্ধি আপনিই জাগ্রত হবে। তখন হয়তো সে আবার আমাকে ডেকে পাঠাবে। ওকে আমি সন্তানের মতই স্নেহ করি। তখন আমি অভিমান করে দূরে সরে থাকব না।

—পর্ণা যে একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত, এ খবর আপনি কেমন করে জানলেন?

—ঐ যে বললাম, এসব কথা আমাদের জানতে হয়। এতবড় কারখানাটা যাকে চালাতে হয়, তাকে অনেক খবর সংগ্রহ করতে হয়।

—ওঁকে আপনি বলেছিলেন সে কথা? উনি বিশ্বাস করেননি?

—তার বুদ্ধি যে আচ্ছন্ন হয়ে আছে মা। তাকে ঐ মেয়েটি সম্মোহিত করে ফেলেছে।

কেমন যেন মাথা কাটা গেল আমার।

বৃদ্ধ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। আমি স্থাণুর মত বসেই রইলুম।

সারারাত ঘুম হল না। আবোল তাবোল চিন্তায় সমস্ত রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ করেছি। কেন এমন হল? অলক আর সুনন্দা দুটি সুখী প্রাণী। আদর্শ দম্পতি। ভেবেছিলুম একটি মেয়ে জীবনে যা যা কামনা করতে পারে সবই আমার করতলগত হয়েছে। সম্মান, প্রতিপত্তি, বিলাস, বৈভব—রূপবান, স্বাস্থ্যবান স্বামীর একান্ত প্রণয়। কী নয়? নিজের পছন্দমত শাড়ি গাড়ি কিনেছি। নিজে আর্কিটেক্টের সঙ্গে আলোচনা করে এই প্রাসাদোপম বাড়িটি তৈরী করিয়েছি। কোন্ ঘরে কি রঙের টাইল বসবে, কি রঙের

প্লাস্টিক ইমালশান রঙ হবে, কি ধরণের পর্দা হবে—সব আমি স্থির করে দিয়েছি। এমনকি গেটের পাশে আলোর টোপর-পরা বাড়ির ঐ নেমপ্লেটে কি লেখা হবে তাও স্থির করে দিয়েছি আমি। মনে আছে এ প্রসঙ্গে ওর সঙ্গে যে রহস্যালাপ হয়েছিল। বাড়ি যখন শেষ হয়ে এল অলক বললে—এবার এ বাড়ির একটা নামকরণ করতে হয়।

আমি বলেছিলুম—কর। বাড়িটার কোথায় কি করতে হবে তা আমিই নির্ধারণ করেছি, অন্তত নামটা তুমি দাও।

ও বলেছিল—বাড়ির নামকরণ সম্বন্ধে ডক্টর জনসন কি বলেছেন জান? আমি বলি—ডক্টর জনসনের উপদেশ থাক। তুমি চটপট একটা নামকরণ কর দেখি।

—সে কি হয়। তুমি বাঙলার ছাত্রী। নাম দিতে হয়, তুমিই দেবে। মনে আছে, আমি বলেছিলাম—তবে নাম দাও "অলকাপুরী!"

ও লাফিয়ে উঠে বলেছিল—কক্ষণও নয়! অলকের নাম থাকবেই না, ওর নাম হোক 'নন্দালয়'।

তাতে আমার ঘোর আপত্তি। শেষ পর্যন্ত মধ্যপথে রফা হল আমাদের। নামটা আমিই দিলাম অবশ্য—'অলকনন্দা।'

অলক আর সুনন্দা দুটি নাম একসঙ্গে গ্রথিত হয়ে গেল পাষাণের ফলকে।

হায়রে নাম! সেদিন দূর থেকে কুলুকুলু ধ্বনিতে প্রবাহিত অলকনন্দার ধারাকেই দেখেছিলুম। আজ দেখলুম খাড়া প্রেসিপীস্! অলকনন্দার খাদ! সে খাদ অলকের সোনাতেও ছিল, সুনন্দার সুবর্ণেও ছিল। সংসারের উত্তাপে প্রেম কোথায় থিতিয়ে পড়েছে। উপরে ভাসছে শুধু খাদ!

কিন্তু কেন এমন হল? অলককে নিয়ে আমি সুখী না হবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমার মনের অনেকখানি ছিল ফাঁকা। প্রাপ্তির

প্রাচুর্যে সে ফাঁকটি ভরে নি। প্রেমিকের জন্যে কৃচ্ছ্রসাধনের সুযোগ আমি পাই নি, দাম্পত্য কলহের স্বাদ আমাকে পেতে দেয় নি অলক, —স্বামীর ক্ষুধায় অন্ন যোগাতে নিজের মুখের গ্রাস লুকিয়ে ধরে দেবার যে বিমল আনন্দ তা থেকে সে আমাকে চিরবঞ্চিত করেছিল। তা ছাড়া আমার ভিতরে চিরকালই লুকিয়ে ছিল একজন দুঃসাহসিকা। সে বেপরোয়া, সে দুর্মদ, সে অভিসারিকা। তার খোঁজই জানে না অলক। তাই অন্য কোনও আকর্ষণে দাম্পত্য জীবনচক্রের আবর্তন থেকে কেন্দ্রাতিগ বেগে ছুটে যাবার একটা তির্যক বাসনা আমার মনে জাগলেও জাগতে পারে। গৌতমের সম্মোহনে সম্মোহিত হবার উপাদান ছিল আমার রক্তের স্বাক্ষরে। কিন্তু সে কেন এমন লুটিয়ে পড়ল ঐ সামান্যার মোহে? কি আছে পর্ণার, যা আমার নেই। কোন স্বাদে অলক বঞ্চিত আমার কাছে?

অত্যন্ত অপমানিত বোধ করলাম। স্থির করলাম, এ অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। অলক যদি একনিষ্ঠ প্রেমের মর্যাদা না দেয় তাহলে আমিই বা সে দায় একা বয়ে বেড়াব কোন্ দুঃখে!

পরদিন সকালে উঠেই ছুটলাম গৌতমের ছাপাখানায়।

এবার আর আটপৌরে শাড়ি নয়, স্বাভাবিক সাজে। ভড়ংও নেই আড়ম্বরও নেই। যে বেশে সেই কলেজ জীবনে দেখা হত আমাদের, সেই বেশে। ট্যাক্সি করেই যেতে হল। বাড়ির গাড়িও পাড়ায় নিয়ে যাবার কি দরকার? গৌতম ছিল না তার ছাপাখানায়। ছিলেন সেই ভদ্রলোক, যিনি সেদিন আমাদের দু কাপ চা এনে দিয়েছিলেন।

কথাবার্তা শুনে মনে হল তিনি এখনও আমার পরিচয়টা জানেন না। গৌতম কখন আসবে তা তিনি বলতে পারলেন না।

বললাম—কোথায় গেলে তাঁর দেখা পেতে পারি?

—বাসাতেই থাকেন এ সময়। অবশ্য এখন আছেন কিনা জানি না।

—বাসা কোথায় ?

—যাবেন আপনি ? বেশীদূর নয়। এই গলিটা দিয়ে কিছুদূর গেলেই একটা বাঁশের পুল পাবেন। সেটা পার হয়েই ডানহাতি করোগেট টিনের চারচালা বাড়ি। যাকে শুধাবেন, সেই পথ বাৎলে দেবে।

—আর কে কে আছেন তাঁর বাসায় ?

—তিনি, তাঁর স্ত্রী আর একটি ছেলে। স্ত্রী অবশ্য আজ নেই। কাল কোথায় যেন গেছেন।

—কোথায় গেছেন ?

—তা তো জানি না। কাল রাত্রে এখানে এসে বললেন যে দুচার দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছেন। গৌতমবাবু তখন এখানেই ছিলেন কিনা।

—ও।

—চলুন, আপনাকে বরং দেখিয়ে দিই।

কৌতূহল প্রবল। তার উপরে গৌতমের স্ত্রী আজ বাড়ি নেই। এ সুযোগ ছাড়া হবে না। দেখে আসা যাক ওর সংসারের স্বরূপ। সংসারের প্রেমে সে নাকি মশগুল হয়ে আছে।

ভদ্রলোক দরজায় শিকল তুলে তালা লাগালেন। দুজনে পথে নামি। নোংরা গলি। যেখানে সেখানে নির্বিচারে ময়লা ফেলা আছে। পথ জুড়ে শুয়ে আছে রোমন্থনরত নিশ্চিন্ত গো-শাবক। নির্বিচারে উলঙ্গ দুটি শিশু পথের ধারে প্রাতঃকৃত্য করতে বসেছে। একটা ঠেলাওয়ালা পথের আধখানা আটক করে পড়ে পড়ে ঘুমাচ্ছে। মুখের উপর গামছা ফেলা। দেখতে দেখতে পথ চলেছি। সামনের বাড়ির বউটি আঁচল দিয়ে সারা গা ঢেকে একটা এনামেলের পাত্রে আঁজলা ছাই নিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে এল পথে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। এত সুন্দরী মেয়ে বোধহয় এসব পাড়ায় আসে না। বউটি ছাই ফেলতে ভুলে যায়। অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে আমার

দিকে। এ মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমি অভ্যস্ত। এতদিন ভাবতুম এ আমার রক্ষাকবচ—সহজাত কবচকুণ্ডল। হায় রে রূপ! সে দেমাক আমার গেছে।

—সাবধানে পার হবেন।

বাঁশের পুলের কাছে এসে গেছি। আমি চাই না যে, ও ভদ্রলোক আমার সঙ্গে আসেন। তাই তাঁকে বিদায় করবার জন্য বলি—এবার আমি যেতে পারব। ঐ বাড়িটা তো?

ভদ্রলোক, মনে হয়, ক্ষুণ্ণ হলেন। আমার পাশে চলতে বেশ একটা আনন্দ বোধ করছিলেন বোধকরি। কিন্তু আমার কথার জবাবে তাঁকে বাধ্য হয়ে বলতে হল—আজ্ঞে হ্যাঁ। আচ্ছা, আমি তাহলে চলি।

—হ্যাঁ আসুন।

ছোট্ট দুকামরা বাড়ি। টিনের চালা, মুলিবাঁশের ছেঁচাবেড়ার দেওয়াল। মেঝেটা অবশ্য পাকা। সামনে একটু বাগান। তাতে নানান ফুলের গাছ। বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। মধুমালতীর গেট। সন্ধ্যামনি, বেলি, জুঁই, দণ্ডকলস আর রজনীগন্ধার চারা। আমার দিকে পিছন ফিরে গৌতম বেড়া বাঁধছিল। আদুল গা। পরণে একটা পায়জামা। গলায় মোটা পৈতে। চুলগুলো অবিন্যস্ত। সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে গেছে। তার একহাতে একখানা কাটারি, অন্য হাতে আধলা বাঁশ। গেটটা খুলতেই মুখ তুলে তাকায়। অবাক হয়ে যায় গৌতম। উঠে দাঁড়ায়, বলে—তুমি?

হেসে বলি—হ্যাঁ আমিই—কিন্তু ভিতরে আসব তো?

—কেন আসবে না?

—আমি যে নিরস্ত্র, আর তুমি সশস্ত্র! বিশ্বাসঘাতককে খতম করতে কতক্ষণ?

—ছিঃ! কী যা তা বলছ? এস, ঘরে এস—

দা-খানা ফেলে হাতের ধুলো ঝেড়ে দাওয়ায় উঠে দাঁড়ায়। বেতের মোড়া একখানা টেনে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলে—বস।

একটু অভিনয় করতে হল। বলি, আসতে বলেছ এসেছি; কিন্তু বসতে তো তুমি বলবে না। গৃহস্বামিনীকে ডাক—তিনি অনুমতি করলেই বসতে পারি।

গৌতম হেসে বলে—তিনি উপস্থিত থাকলে তাই হতো। কিন্তু তিনি যে বাড়িতে নেই।

—আয়াম সরি! বাজারে গেছেন নাকি?

—না, তিনি কলকাতাতেই নেই আজ।

—ও হো! তবে তো আমার আসাটাই আজ ব্যর্থ হল।

—তাই নাকি! তাহলে তুমি আমার কাছে আসনি দেখছি।

—না তোমার কাছে নয়, তোমাদের কাছে এসেছিলাম আজ। দেখতে এসেছিলুম কী মন্ত্রে তিনি বশ করেছেন তোমায়।

গৌতম হাসল। জবাব দিল না।

—তোমার ছেলেটি কোথায়?

—ছেলের খবর পেলে কার কাছে?

বলি—গৌতম, আমি তো প্রশ্ন করি নি, তুমি আমার স্বামীর খবর কার কাছে পেয়েছিলে।

গৌতম সে প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে বলে—বল্টু স্কুলে গেছে।

—স্কুল? সে কোথায়?

—ঐ তো! প্রাইমারি স্কুল। এখনই আসবে সে। চা খাবে?

—খেলে তোমাকেই বানাতে হবে তো?

—কেন? তুমিও বানাতে পার।

—পারি? তবে চল।

এলাম ভিতরের ঘরে। ছোট বাড়ি, দুখানি মাত্র ছোট্ট ঘর। ভিতরে একটি বারান্দা। তারই একান্তে রান্নার আয়োজন। কাঠের উনুন। দেওয়ালে লটকানো একটি প্যাকিং বাক্স। তাতে রান্না করার নানান উপচার। মশলার কৌটা, আচার, নুনের কেঠো। একটা ঝুড়িতে কিছু আনাজ। আলু, বেগুন, পেঁয়াজ, কচু আর আদা।

মাটির কলসিতে মোটা চাল। ছোট্ট একটি বঁটি, চাকতি-বেলুন, শিল-নোড়া। গৌতম বললে—সরো, উনুনটা জ্বেলে দিই।

—থাক মশাই, আমিই পারব।

—না পারবে না—ফুঁ দিতে দিতে শুধু শুধু চোখে জল আসবে।

হেসে বলি—শরৎবাবুর বইতে পড় নি রান্নাঘরের ধোঁয়া বাঙালি মেয়েদের চোখের জল লুকোবার একটা ভাল অছিলা?

—তোমারও কি কোটেশান খেলার বাতিক আছে নাকি?

চমকে উঠে বলি—তার মানে?

গৌতম অপ্রস্তুত হয়ে যায়। আমতা আমতা করে বলে—শুনেছি মিস্টার মুখার্জি নাকি এ্যাপ্ট কোটেশানের ভারি ভক্ত।

—সেটাও শুনেছ? এত কথা শোন কার কাছে?

গৌতম আমার কথা আমাকেই ফিরিয়ে দেয়। বলে—আমি তো প্রশ্ন করি নি সু—আমার ছেলের কথা তুমি কার কাছে শুনেছ!

হেসে বলি—কুইটস্! নাও সরো, উনুনটা ধরাই।

কিন্তু কী লজ্জা! কিছুতেই জ্বালতে পারি না কাঠের উনুনটাকে। গৌতম একটু দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। এতক্ষণে এগিয়ে এসে বলে—নাও, খুব হয়েছে। বরং এইটা জ্বেলে নাও।

জনতা স্টোভ একটা টেনে আনে কোথা থেকে।

দুকাপ চা তৈরি করে নিয়ে এসে বসলাম ওর ঘরে! সেইটা মনে হয় ওদের শয়নকক্ষ। এটাই বড় ঘর। দুখানি চৌকি পাতা। ধবধবে সাদা চাদর। বালিশ-ঢাকায় কাজ করা। ছোট একটি টিপয় টেনে আনল গৌতম। চায়ের কাপ দুটি রাখল তার ওপর। আমি বলি—টিপয়ও আছে?

গৌতম হেসে টেবিল-ঢাকাটা তুলে ফেলে। কেরোসিন কাঠের বাক্স একটা। সুদৃশ্য টেবিলঢাকায় তার ভোলটাই পাল্টে গেছে। গৌতম হেসে বলে—অত কৌতূহল দেখিও না সু! নিম্ন মধ্যবিত্তের

সংসার খুঁটিয়ে দেখতে চেয়ো না। কোনক্রমে উপরের ঐ কোঁচায় পত্তনটি বজায় রেখেছি আমরা। ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন।

আমি হেসে বলি—সে সর্বত্রই। পোষাকের তলায় সবাই উলঙ্গ!

আবার একটু চুপচাপ।

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি ওর গৃহস্থালির আয়োজন। উপকরণ সামান্যই—কিন্তু কি সুন্দর গুছিয়ে রেখেছে। মনে হল, সুন্দর গৃহস্থালির একটি অনিবার্য উপকরণ হচ্ছে 'অভাব'! প্রাচুর্যের মধ্যে কিছুতেই এ মাধুরী ফুটিয়ে তোলা যাবে না। ঐ যে ছেঁড়া শাড়ির পাড় দিয়ে মোড়ার উপর আসন তৈরী হয়েছে, ঐ যে মাটির ঘটে আলপনা দিয়ে স্থলপদ্ম রাখা আছে, ঐ যে ছেঁড়া ধুতি বাসন্তি রঙে ছুপিয়ে জানালার পর্দা করা হয়েছে—ও জিনিস কিছুতেই পাওয়া যাবে না সুনন্দা মুখার্জির ড্রইংরুমে। কারণ ওর মূল সুরটাই হচ্ছে অভাবের মাঝখানে ফুটে ওঠা রুচি বোধ। তাজা পদ্মফুলের অনিবার্য অনুষঙ্গ যেমন পাঁক, এই গৃহস্থালির মূল সুরটিও যেন তেমনি—অনটন। এমনটি করে ঘর সাজাতে পারব না আমি কোনদিন—এ কি আমার কম দুঃখ! জোর করে মাটির ঘট নিয়ে গেলে তাতে উপহাসের হাওয়াটাই লাগবে, অনাবিল হাসির সুরটা ফুটবে না।

—কি দেখছ অত চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে?

—দেখছি মিসেস্ ব্যানার্জির কোন ফটো আছে কিনা দেওয়ালে।

—হতাশ হতে হবে তাহলে তোমাকে। তাঁর কোন ফটো এ বাড়িতে নেই।

আমি বলি, বুঝেছি। 'নয়ন সমুখে তুমি নাই, নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।'

গৌতম হেসে বলে—নো কোটেশনস্ প্লীজ! আমি ওটা একদম সইতে পারি না।

—তুমি দেখছি অলকের একেবারে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা।

—তা বলতে পার!

আবার কিছুটা চুপচাপ।

নীরবতা ভেঙে আবার আমাকেই বলতে হয়—তোমার চিঠি পেয়েছি কিনা প্রশ্ন করলে না তো?

—প্রশ্ন না করলেও বুঝতে পারছি তা তুমি পেয়েছ।

—তবু ঢুকতে দিলে বাড়িতে? ভয় নেই?

—ভয় কিসের?

—যদি আবার বিশ্বাসঘাতকতা করি?

গৌতম হেসে বলে—সে জন্যে তো তুমি আস নি।

—তবে কেন এসেছি?

—তা তুমিও জান, আমিও জানি—কী দরকার সেই কথাটা উচ্চারণ করে। সেটা অকথিতই থাক না। তাতে তার মাধুর্য বাড়বে।

কেমন যেন লজ্জা করে ওঠে। মুখটা আর তুলতে পারি না। নিচু মুখেই অস্ফুটে বলি—একটা কথা সত্যি করে বলবে?

—বল?

—আমাদের গেছে যা দিন, তা কি একেবারেই গেছে? কিছুই কি নেই বাকি?

গৌতম স্মিতমুখে চুপ করে বসে থাকে।

বাধ্য হয়ে বলতে হয়—কই জবাব দিলে না?

—ভাবছি, এত কোটেশন দিচ্ছ কেন আজ। ধার করা কথা ছাড়া নিজের কথা কিছু বলতে পার না?

—মানে?

—মানে, তোমার ও কথার জবাবে একটি মাত্র কথাই তো বলা চলে—'রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে'!—কিন্তু তুমি-আমি তো তোতাপাখী নই সু!

অপ্রস্তুত হতে হল। বলি—বেশ, স্থূলভাবেই প্রশ্ন করছি—মিসেস্

ব্যানার্জি কি তোমার মনের সবটুকুই ভরিয়ে রেখেছেন—কিছুই কি নেই বাকি ?

গৌতম একটুক্ষণ চুপ করে রইল—তারপর বলে – এ প্রশ্নটার জবাব দেওয়া কি আমার পক্ষে শোভন ? থাক না ও কথা !

আমি হেসে বলি – আমার প্রশ্নের জবাব তুমি দিলে না গৌতম ; কিন্তু তোমার চোখ মুখ বলছে সে কথা ! তোতাপাখীর কথা নয়, আমি যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, তোমার চোখের তারায় ফুটে উঠেছে সেই তারা যা লুকিয়ে রেখেছিলে তোমার দিনের আলোর গভীরে।

গৌতম একটু সচকিত হয়ে বলে—সুনন্দা, আজ তোমার মন নিজের এক্তিয়ারে নেই। আমি বুঝতে পারছি, কোন কারণে তুমি আঘাত পেয়েছ মিস্টার মুখার্জির কাছে। কিন্তু আমাদের এমন কোন কিছু করা উচিত হবে না, যার জন্য পরে অনুতাপ করতে হয়।

হঠাৎ যেন রক্তে দোলা লাগল আমার ! মনে হল, কিছুই খোয়া যায় নি। পর্ণার কবল থেকে একদিন যেমন মোহজাল বিস্তার করে ছিনিয়ে এনেছিলাম গৌতমকে, আজও তেমনি ওকে এক মুহূর্তে ছিনিয়ে আনতে পারি এই অচেনা অজানা মিসেস্ ব্যানার্জির নাগপাশ থেকে। আমার উষ্ণ যৌবন, দীপ্ত নারীত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না গৌতম! একটু ঝুঁকে পড়ে বলি—অনুতাপ কিসের গৌতম? তুমি ঠিকই বলেছ—একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়েই ছুটে এসেছি আমি। কিন্তু তুমি কি একটা মুহূর্তের জন্যও সে ক্ষতচিহ্নে সান্ত্বনার প্রলেপ দিতে পার না ? এমন কিছু আমাকে দিতে পার না যা নিয়ে—কথাটা শেষ করতে পারি না। গৌতম উঠে দাঁড়ায়—বলে, প্লীস সু। আমিও রক্তমাংসে গড়া মানুষ। এভাবে আমাকে প্রলুব্ধ কর না।

আর স্থির থাকতে পারি না আমি। আসন ছেড়ে আমিও উঠে দাঁড়াই ; বলি – তাহলে আজ আমাকে এমন কিছু একটা দাও –

এবারও শেষ হয় না কথাটা। আমাকে হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে গৌতম আমার পিছন দিকে তাকায়। চকিতে ঘুরে দাঁড়াই। দেখি

পিঠে স্কুলের ব্যাগ নিয়ে হাফপ্যাণ্ট পরা একটি বছর ছয়েকের ছেলে এসে দাঁড়িয়েছে দরজার সামনে। জুল জুল চোখে চেয়ে দেখছে আমাকে। হঠাৎ কি হল আমার। মুহূর্তে ছোঁ মেরে তুলে নিলাম তাকে। বুকের মধ্যে চেপে ধরলাম সজোরে। চুমায় চুমায় ভরিয়ে দিলাম তার গাল ছুটো।

গৌতম স্মিতহাস্যে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল আমার কাণ্ড।

॥ সাত ॥

'ল্যভ ইজ লাইক দ্য মুন; হোয়েন ইট ডাজ নট ইনক্রিজ ইট ডিক্রিজেস্।' কোটেশনটা কার, ঠিক এই মুহূর্তে মনে আসছে না। কিন্তু কথাটা একেবারে খাঁটি। অর্থাৎ প্রেম ঠিক চাঁদের মত—যখন বৃদ্ধি পাওয়ার আর উপায় থাকে না, তখন তা হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। আমার ক্ষেত্রে কথাটা অদ্ভুতভাবে ফলেছে।

অলক আর সুনন্দা। আমরা এক আদর্শ দম্পতি। দুজনে মিলে গড়ে তুলেছিলুম এই অলকনন্দা। তুষারদ্রব সুরগঙ্গা। এ অলকনন্দার ধারা ছিল নির্মল, পবিত্র, স্বর্গীয়। পার্থিব মলিনতার স্পর্শ লাগে নি এর গায়ে। আমাদের দুজনেরই মন ছিল কানায় কানায় ভরা—দুজনকে নিয়ে।

মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথে শুনেছি অলকনন্দার অববাহিকা ধরে চলতে হয়। যাত্রীদল অন্যমনে পথ চলে—লক্ষ্য তার মহাতীর্থের দিকে—সারা পথে অলকনন্দার উপলমুখের কুলুকুলু ধ্বনি শুনতে শুনতে চলে; সারা পথ দেখতে দেখতে যায় স্বচ্ছতোয়া রজতশুভ্র জলধারার প্রবাহ। দূর থেকে অলকনন্দা ওদের উৎসাহ যোগায়, প্রেরণা দেয়। কিন্তু ক্ষণিক বিচ্যুতিতে যদি ঐ স্রোতস্বিনীর খাড়া

খাদের দিকে যাত্রীর পদস্খলন হয়, তখন ঐ অলকনন্দা ভয়ঙ্করী মৃত্যুর মত করাল গ্রাসে টেনে নেয় তাকে। ফেনিল আবর্তে অবলুপ্ত হয়ে যায় তীর্থযাত্রীর শেষচিহ্ন।

আমাদেরও হয়েছে তাই। খেয়াল-খুশীতে পথ চলতে চলতে হঠাৎ এসে দাঁড়িয়েছি অলকনন্দার খাদের সম্মুখে। আমরা দুইজনেই! জানি না, পদস্খলন কার আগে হবে।

সুনন্দার কথা ঠিক জানি না। নিজের কথাটা জানি। এতদিন আকণ্ঠ ডুবে ছিলুম নন্দার প্রেমে। শশীকলার মতই দিন দিন তার প্রতি আকর্ষণ বেড়ে চলছিল; কিন্তু তারপর যেমন হয়। মন যখন একেবারে কানায় কানায় ভরে গেল তখনই দেখলুম—মনের অনেকটাই ফাঁকা। আর তারপর—'হোয়েন ইট ডাজ নট ইনক্রিজ ইট ডিক্রিজেস!'

এটা বোধহয় পুরুষের ধর্ম। যা পাওয়া গেছে তার উপর আর মোহ থাকে না—যা পাওয়া গেল না, মনটা তাকে নিয়েই মেতে ওঠে। রবিঠাকুরের কি একটা লাইন আছে না? 'যাহা পাই না তাহা চাই না'—না ঐ জাতীয় কি?

আজ আর অস্বীকার করে লাভ নেই পর্ণা আমার মনে আবর্ত তুলেছিল। হয়তো তার জন্য কিছুটা দায়ী আমার স্বাভাবিক পুরুষের ধর্ম, কিছুটা হয়তো তার বিচিত্র মোহবিস্তারের কায়দা—হয়তো বা কিছুটা সুনন্দার সাম্প্রতিক ব্যবহার।

ভেবেছিলুম, মনের এ পরিবর্তনটুকু গোপন করে যাব। বস্তুত আমার চেতন মনের কাছে প্রথমাবস্থায় অবচেতন মনও এটা গোপন রাখতে পেরেছিল। কিন্তু প্রথমাবস্থায় তো চিরকালই কোন কিছু থাকে না। আর এ এমন একটি জিনিস যা চিরকাল লুকিয়েও রাখা যায় না। হার্বার্ট ঠিকই বলেছেন—'এ ল্যভ এ্যাণ্ড এ কাফ্ ক্যা নট বি হিড।' প্রেম আর সর্দি-কাশি লুকিয়ে রাখা অসম্ভব। সুনন্দা কিছুটা আন্দাজ করেছে এতদিনে।

যেদিন বুঝলুম—সুনন্দা আন্দাজ করেছে, সেদিন থেকে আরও যেন বেপরোয়া হয়ে পড়েছি। সেই বেলেঘাটার মোড়ে মধ্যরাত্রে শোনা 'ডনের' উদ্ধৃতিটাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না!

কিন্তু আপাতত আমার মনের কথা থাক। তার চেয়ে বড় বিপদ ঘনিয়ে উঠেছে বাস্তবে। যার জন্য ছুটে আসতে হয়েছে এই বর্ধমানে।

কিছুদিন থেকে লক্ষ্য করেছি, আমাদের কারখানা থেকে গোপনতম খবর কেমন করে জানি বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে। এতদিন পর্ণা ও-তরফের গোপন খবর সরবরাহ করত আমাকে। সেটা বন্ধ হয়ে গেছে অনেকদিন। পর্ণা বলে, তার সেই পঞ্চাশটাকা বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাবের পর থেকেই। যেমন করেই হোক ও-পক্ষ সে খবরটা পেয়ে গিয়েছিল—এবং তারপর থেকেই শ্রমিক নেতা ব্যানার্জি আর পাত্তা দেয় না পর্ণাকে। এখন আবার গোপন খবরের স্রোত উজান বইতে শুরু করেছে। কে আছে এর মূলে? পর্ণাকে সন্দেহ করতে মন সরে না। সে এখন পুরোপুরি আমার এক্তিয়ারে। সে আমাকে ভালবেসেছে। গৌতমের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে সে আরও ঘনিয়ে এসেছে আমার কক্ষপুটে। কুমারী মেয়ে যখন কাউকে ভালবাসে তখন তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না। যতদিন না আমার কাছ থেকে প্রতিহত হচ্ছে ততদিন সে এ কাজ করবে না।

তাহলে কে?

অনেক চিন্তা করে শেষ সিদ্ধান্তে এলুম অবশেষে। আমি ছাড়া এসব গোপন খবর আর একটি মাত্র প্রাণী জানতেন। তিনি শম্ভুচরণ-বাবু। বাবার আমলের লোক। তাঁকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেছিলুম। তাঁকে সন্দেহ করাও অত্যন্ত কঠিন। তবু তাই করতে হল। জানতে পারলুম, আমাদের এমন কয়েকটি গোপন খবর বাইরে বেরিয়ে গেছে যা আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ জানে না। পর্ণাও নয়। শম্ভুবাবু নিজেই সেসব চিঠি টাইপ করেছেন—স্টেনোর মাধ্যমে ছাপা হয় নি সেগুলো। চিঠিগুলি যে কনফিডেন্সিয়াল ফাইলে থাকে তার চাবি

অবশ্য মাঝে মাঝে পর্ণাকে দিতে হয়েছে—কিন্তু সে ফাইল পর্ণা পড়ে দেখেনি নিশ্চয়।

অগত্যা চরম অপ্রিয় কাজটা করতে হল শেষ পর্যন্ত। বরখাস্ত করলুম শম্ভুবাবুকে। ভদ্রলোক বোকার মত তাকিয়ে থাকলেন অর্ডার-খানা হাতে করে। আমাকে তিনি 'খোকা' বলে ডাকতেন বাবার আমলে। এখনও অবশ্য 'স্যার' বলেন না—মুখার্জিসাহেব বলেন।

বিহ্বলের মতো বললেন—এ কথা তুমি বিশ্বাস কর?

গম্ভীর হয়ে বলেছিলুম—দেখুন, আমার বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠছে না। এটা জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধান্তের মত, প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। বোম্বাইয়ের ডীলটা আপনাতে আমাতে হয়েছে। লংহ্যাণ্ডে সমস্ত করেসপণ্ডেন্স আমি লিখেছি, টাইপ করেছেন আপনি। তৃতীয় কোন লোকের এ খবর জানার কথা নয়। সুতরাং এ খবর লীক হলে দায়ী হবেন হয় আপনি, নয় আমি। যেহেতু আমি মালিক এবং ক্ষতিটা আমার, তাই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ টেঁকে না! কিন্তু আপনি? বায়রণের ভাষায় 'দেয়ার ইজ নো ট্রেটর লাইক্ হিম্ হুজ ডোমেস্টিক ট্রিসন্ প্ল্যাণ্টস্ দ্য পনিয়ার্ড উইদিন দ্য ব্রেস্ট দ্যাট ট্রাস্টেড টু হিজ ট্রুথ।' বুঝলেন?

শম্ভুবাবু জবাব দিতে পারেন নি। জবাব ছিল না যে। তখন নিজে থেকেই বললুম—আপনি কোম্পানির যে ক্ষতি করেছেন তাতে আপনার প্রতি কোন করুণা দেখানোর কথা নয়। তবু আপনার পাস্ট সার্ভিসের কথা মনে করে আপনাকে একমাসের বেতন দিয়ে দিচ্ছি। কাল থেকে আপনি আর আসবেন না অফিসে। য়ু আর ডিস্‌মিসড্। ভেবেছিলুম নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে অফিসটাকে। শম্ভুবাবুর মত কর্মদক্ষ বিশ্বাসী লোক যোগাড় করা কঠিন—তবু ডান হাতেও যখন গ্যাংগ্রিন হয়, মানুষ তাও তো কেটে ফেলে।

ছোটাছুটি বেড়ে গেল। মাথার উপর খড়্গ ঝুলছে। শত্রুপক্ষের

হাতে ট্রাম্পকার্ডখানা চলে গেছে। নিশ্চয়ই এখনও তা সরকারী মহলে পৌঁছায় নি। না হলে এনফোর্সমেন্ট পুলিস এতক্ষণে হানা দিত আমার অফিসে। নিশ্চয়ই ও পক্ষ একবার ব্ল্যাকমেইলিং করবার চেষ্টা করে দেখবে খবরটা পেশ করার আগে। তাই তার আগেই ছুটে এসেছি বর্ধমানে। বড় কর্তাদের কাছে আগে ভাগে সাফাই গেয়ে রাখলে যদি কিছু হয়। শুনলাম, সরকারী বড়কর্তা বর্ধমানে এসেছেন ইন্সপেকশনে, উঠেছেন সার্কিট হাউসে। তাই আমিও ছুটে এলুম এতদূর।

কিন্তু সে চেষ্টাও সুবিধের হল না। বড়কর্তার সময়ই হল না।

বর্ধমানের উত্তরে গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের ধারে একটা বিস্তৃত জমি নাইন্টি নাইন ইয়ার্স লিজ নিয়েছি আজ বছর চারেক। ইচ্ছা ছিল এখানে নতুন একটি কারখানা গড়ে তুলব। ফরেন এক্সচেঞ্জ যোগাড় করতে পারি নি—নানান তালে ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছে সে পরিকল্পনা। শুধু জমিতে প্রবেশ করবার মুখে এই ছোট্ট বাঙলো বাড়িটি বানিয়েছি। বর্ধমানে এলে আমি এখানেই উঠি। এবারও তাই উঠেছি।

কাল বিকালে একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। সারাদিন খাটাখাটনিতে ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে বিশ্রাম নিচ্ছি। গাড়িতে ক্লান্তিনাশক ঔষাধাদি আমার বরাবরই থাকে। ড্রাইভার যোগীন্দর সিং সেগুলো নামিয়ে দিয়ে গেল। জুত করে বসেছি, এমন সময় এখানকার দারোয়ান এসে খবর দিল কয়েকজন লোক আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। প্রথমটা অবাক হলুম। এখানে কে আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে। যাই হোক তাদের ডেকে পাঠালুম।

তিনজন লোক এলেন দেখা করতে। ভদ্রলোক বলা ঠিক হবে না। অথচ ঠিক ছোটলোকও নয়। ময়লা জামা কাপড় পরা, অথচ পায়ে জুতো অথবা চটি। কে এরা? বসতে বলব কিনা স্থির করবার আগেই দেখি ওরা দিব্যি জাঁকিয়ে বসল।

—কী চাই? জানতে চাইলুম আমি।

মুখপাত্র হিসাবে যে ছোকরা কথা বলল তার বয়স অল্প। বছর পাঁচিশ ছাব্বিশ হবে। পরণে পায়জামা, গায়ে চুড়িদার পাঞ্জাবী, চুলগুলো অবিন্যস্ত, মুখে বসন্তের দাগ। বললে—আপনার সঙ্গে গোপন কিছু কথা ছিল।

বলি, এর চেয়ে নির্জন স্থান আমার জানা নেই, কিন্তু কে আপনারা? ছোকরা পরিচয় দিল। নিজের নয় পাশ্ববর্ত্তী লোকটির। তাকিয়ে দেখলুম তার দিকে। বছর পঞ্চাশ বয়স, চিবুকে ছোট্ট নূর, চোখে গগল্‌স এই ঘরের ভিতরেও। শুনলাম তাঁর নাম আবদুল গণি। তিনি নাকি বার্নপুর অঞ্চলের নামকরা শ্রমিক নেতা।

ভদ্রলোক হাত তুলে আমাকে নমস্কার করে বলেন—আপনার সঙ্গে কখনও পরিচয় হয় নি, কিন্তু আপনার নাম শুনেছি। আমরা আপনার সঙ্গে দেখা করতে কলকাতা যেতুম; কিন্তু আপনি এখানে এসেছেন শুনে এখানেই এলুম।

বলি—সে প্রসঙ্গ তো হল—কিন্তু কেন এসেছেন সেটা তাড়াতাড়ি বলে ফেললেই ভাল হয় না?

ছোকরা বললে—আপনার যেন একটু তাড়াতাড়ি আছে মনে হচ্ছে স্যার?

বলি—তা আছে। আপনাদের যা বক্তব্য তাড়াতাড়ি সেরে নিলেই আমি খুশী হব।

মিস্টার গণি বলেন—খুব সংক্ষেপেই সেরে ফেলি তাহলে। প্রথম কথা, আপনার কারখানার শ্রমিকদের কোনও য়ুনিয়ান নেই; কিন্তু তারা আমাদের শ্রমিক য়ুনিয়ানের সঙ্গে এ্যাফিলিয়েটেড হতে চায়—

আমি হেসে বলি—ব্যাপারটা তো বুঝলুম না। আমাদের কারখানায় য়ুনিয়ান থাকলে তারা অন্য কোথাও এ্যাফিলিয়েসন চাইতে পারত—কিন্তু যার মাথা নেই সে কেন মাথাব্যথার ওষুধ খুঁজতে আসবে?

গণি বলেন—ওরা মাথাব্যথার ওষুধ খুঁজতে আমাদের কাছে

আসে নি, মাথা খুঁজতেই এসেছে। ওদের ঘাড়ের উপর যে মাথা আছে এটা আপনাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে নিতেই আমাদের সাহায্য চাইছে।

বাধা দিয়ে বলি—এসব আলোচনা আমি আপনাদের সঙ্গে করতে চাই না। আমার কারখানায় য়ুনিয়ান নেই বটে, কিন্তু তাদের মুখপাত্রদের ডেলিগেশনের বক্তব্য আমি শুনেছি। তাদের আর কোন বক্তব্য থাকলে তারাই জানাবে। আপনাদের কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

গণি একটু হেসে বলেন—মিস্টার মুখার্জি, তবু আমাদের বক্তব্য আপনাকে শুনতে হবে। তাতে আপনারই মঙ্গল।

বিরক্ত হয়ে বলি—প্লীজ মিস্টার গণি, আপনারা এবার উঠুন। আপনাদের প্রতি দুর্ব্যবহার আমি করতে চাই না, কিন্তু আমাকে বাধ্য করবেন না আপনারা। আমি এখন বিশ্রাম করতে চাই।

মিস্টার গণি বলেন—যে জন্যে আপনি বর্ধমানে ছুটে এসেছেন আমরা কিন্তু সেই বম্বে ডীলটার বিষয়েই আলোচনা করতে এসেছি!

আমার মুখে কথা ফোটে নি।

গণি দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন, বলেন—কি বলেন? বিশ্রাম করবেন না আলোচনা করবেন?

মনস্থির করে নিয়ে একটু বিস্ময়ের ভান করে বলি, কোন বম্বে ডীল? কিসের কথা বলেছেন আপনি?

গণি আবার বসে পড়েছিলেন। আমার বিস্ময়প্রকাশের অভি-ব্যক্তিতে কৌতুক বোধ করে বলেন—ও হো, আপনার মনেই পড়ছে না বুঝি? আই সী! তা হবে। হয়তো এ জাতীয় কারবার প্রতি সপ্তাহেই একটা দুটো করছেন, তাই মনে পড়ছে না। আচ্ছা একটু রেফারেন্স দিলেই মনে পড়বে। আপনার কনফিডেন্সিয়াল ফাইল নম্বর xiv/64 থেকে গতমাসের তেশরা 713/con/xiv/64 নম্বরে যে চিঠিখানা ইন্সিওর্ড ডাকে ইস্যু করা হয়েছে, সেইটির কথা বলছি

আমি। যে চিঠির জন্যে আপনি আপনার বাপের আমলের কর্মচারী শম্ভু দত্তকে বরখাস্ত করেছেন। একটু একটু মনে পড়ছে এবার?

আপাদমস্তক জ্বালা করে ওঠে। মুহূর্তে স্থির করি কি করব। অস্বীকারই করতে হবে। এরা হয়তো কিছুই জানে না, শুধু কোন সূত্রে হয়তো নম্বরটা জানতে পেরেছে। গম্ভীর হয়ে বলি—মিস্টার গণি, আপনার সঙ্গে পাগলামো করার সময় আমার নেই। আপনারা যেতে পারেন।

ভদ্রলোক ধীরে ধীরে ফোলিও ব্যাগ খুলে একখণ্ড কাগজ আমার দিকে এগিয়ে ধরে বলেন—হস্তলিপি-বিশারদ যখন কোর্টে বলবেন এ-লেখা মিস্টার অলক মুখার্জির, তখন তাঁকেও কি পাগল বলবেন আপনি?

স্তম্ভিত হয়ে গেলুম। আমার স্বহস্তে লেখা চিঠিখানির ফটোস্ট্যাট কপি! সর্বনাশ!

—ভুল এভাবেই হয় মুখার্জিসাহেব! টাইপ হয়ে যাবার পর অরিজিনাল খানা ছিঁড়ে ফেলা উচিত ছিল আপনার। দেখুন দেখি কাণ্ড! কোন কর্মচারীর ঘাড়ে দোষ চাপিয়েও জেলের হাত থেকে অব্যহতি পাওয়ার আর উপায় রাখেন নি!

মাথার মধ্যে সমস্ত গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

—সরকার আপনাকে কন্ট্রোল্ড কমোডিটিজের পারমিট দিচ্ছে আপনার ফ্যাকটারীর জন্যে। বম্বের কালোবাজারী মহাজনের কাছে তা বেচে দেবার জন্য নয় নিশ্চয়!

কি বলব ভেবে পাই না।

গণি ঘনিয়ে আসেন—দেখুন স্যার, ব্ল্যাকমেলিং করতে আমরা আসি নি। আপনার ফ্যাকটারীর কোন লোক এসব কথা আপনাকে বলতে এলে লজ্জায় আপনার মাথা কাটা যেত। তাই তাদের হয়েই কথাবার্তা বলতে এসেছি। ওদের ন্যায্য দাবিদাওয়াগুলো মেনে নিলে এ সম্বন্ধে আর কোন উচ্চবাচ্য হবে না।

আর ইতস্তত করে লাভ নেই। বলি—বেশ, কিন্তু এখানে তো সে সব কথা হতে পারে না। আপনারা কাল আমার সঙ্গে অফিসে দেখা করুন। সেখানেই যা হয় স্থির করা যাবে।

—এটা শুভ প্রস্তাব। আশা করি কেমন করে এ চিঠি বেরিয়ে গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামাবেন না আপনি।

একটু রুক্ষস্বরে বলি—এটা আপনার পক্ষে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না মিস্টার গণি?

—আচ্ছা তবে ও প্রসঙ্গে থাক।

ওরা উঠে পড়ে। নমস্কার করে বিদায় নেয়। যাবার আগে বলে—কাল কটার সময় ফ্রি থাকবেন আপনি? এসব কথা তো আবার সর্বসমক্ষে—

বাধা দিয়ে বলি—কাল সন্ধ্যা সাতটায়। অফিসেই।

—আচ্ছা নমস্কার।

ওরা চলে যেতেই বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত একটা কথা মনে হল আমার। ভুল করেছি আমি। শম্ভুবাবু নয়। অন্য কেউ। যার মাধ্যমে এ চিঠি অফিস থেকে বেরিয়ে গেছে সে এখনও আছে আমার কারখানায়। না হলে আবদুল গণি কেন ব্যস্ত হয়ে উঠবে ও বিষয়ে? কেমন করে এ খবর বেরিয়ে গেছে তা নিয়ে আমি অনুসন্ধান চালালে ওর আতঙ্ক-গ্রস্ত হয়ে পড়ার কি আছে,—যদি অপরাধী হন শম্ভুচরণ বাবুই?

শম্ভুচরণ দত্ত নয়,—সর্বনাশী মিস্ পর্ণা রয়!

সমস্ত শরীরে আগুন ধরে গেল। হাত ঘড়িতে দেখলুম বিকাল পাঁচটা: আজ রাত্রেই এর ফয়শালা করতে হবে। তৎক্ষণাৎ যোগীন্দর সিংকে ডেকে পাঠালুম। নির্দেশ দিলুম কলকাতা চলে যেতে। পর্ণাকে নিয়ে আসতে বললুম। অফিসে একটা ট্রাঙ্ককল করে বলে দিলুম মিস্ রয়ের বাড়িতে খবর পাঠাতে। সে যেন তৈরী হয়ে থাকে। অত্যন্ত জরুরী দরকার। গাড়ি যাচ্ছে, সে যেন তাতে চলে আসে।

হিসাব করে দেখলুম রাত দশটা নাগাদ ফিরে আসবে গাড়ি।

কিন্তু আসবে তো পর্ণা ? সে কি আন্দাজ করে নি যে, আমি সব খবর পেয়ে গেছি ? এভাবে তাকে ডেকে পাঠানোর উদ্দেশ্য নিশ্চয়ই সে অনুমান করতে পারবে। সেই যদি অপরাধী হয় তাহলে সে নিশ্চয় জানে যে আজ এখানে আমার কাছে আবদুল গণি আসবে প্রস্তাব নিয়ে। তারপরেই যদি আমি গাড়ি পাঠাই, তখন সে নিশ্চিত বুঝতে পারবে আমার উদ্দেশ্য কী। কোন একটা অছিলা করে সে সরে দাঁড়াবে। হয় তাকে বাড়িতে পাওয়া যাবে না, অথবা তার শরীর খারাপ হবে কিম্বা—আচ্ছা পর্ণার হোমএ্যাড্রেস যা কোম্পানির খাতায় দেওয়া আছে সেখানেই সে থাকে তো ? এ জাতীয় মেয়ের পক্ষে সবই সম্ভব।

বেশ বুঝতে পারছি মাত্রাতিরিক্ত পান করা হয়ে গেছে। এ বোধ ঠিকই আছে যে, আজ রাত্রে আমার পক্ষে মাতাল হওয়া মারাত্মক ; মাথা ঠিক রাখা দরকার। কিন্তু কিছুতেই যেন নিজেকে সামলাতে পারি না। একটানা ঘড়ির টিকটিক ছাড়া আর কোন শব্দ নেই বিশ্ব চরাচরে। মাঝে মাঝে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড দিয়ে দ্রুতগামী মালবোঝাই লরী চলেছে। ঘরের বাতি নিবিয়ে দিয়েছি। রাস্তা দিয়ে গাড়িগুলো যাবার সময় যখন বাঁক ঘুরছে তখন হেডলাইটের ক্ষণিক আলোয় মাঝে মাঝে জ্বলে উঠ্‌ছে ঘরের ভিতরটা—খোলা জানালা দিয়ে আসছে ওদের আলোর আক্রোশ! পর্ণার সঙ্গে বোঝাপাড়ার আজকেই শেষ!

পর্ণা যদি অলক মুখার্জির চরম সর্বনাশ করে থাকে তাহলে পর্ণা রায়কেও আজ রাত্রে কেউ চরম সর্বনাশের হাত থেকে বাঁচাতে পারবে না।

ক্রমশ রাত বাড়ছে।

মাঝে একবার এখানকার বেয়ারাটা খবর নিতে এল নৈশ আহার দিয়ে যাবে কি না। আমার কিন্তু খাবার চিন্তা মাথায় উঠেছে তখন।

রাত সাড়ে এগারোটা নাগাদ গাড়ি ফিরে আসার আওয়াজ পেলুম।

উত্তেজনায় স্থির থাকতে পারি না। বেরিয়ে আসি বাইরের বারান্দায়। গাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে।

যোগীন্দর সিং নেমে এল গাড়ি থেকে। আর কেউ আসে নি।

সেলাম করে একটি খাম এগিয়ে দিল সে।

ছোট্ট চিঠি। পর্ণা লিখেছে—মধ্যরাত্রে 'বসের' বাগানবাড়িতে যাবার কথা নেই তার চাকরির শর্তে। তাকে যেন আমি ক্ষমা করি। কাল সকালে সে আসছে। গাড়ি পাঠাবার দরকার নেই। সকাল নটার মধ্যে সে ট্রেনেই এসে পড়বে। আমি যেন তার জন্য এখানেই অপেক্ষা করি।

আবার স্বীকার করতে হল অত্যন্ত ধূর্ত মেয়ে ঐ পর্ণা রায়!

॥ আট ॥

সমস্তটা দিন কোথা দিয়ে কেটে গেল। অলক আজকেও ফিরবে না নাকি? কিন্তু পর্ণাকে টেলিফোন করে ডেকে পাঠিয়েছে কেন? দুজনে কি করছে ওরা?

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হল। ক্রমে সন্ধ্যা। তারপর আবার ঘনিয়ে এল রাত। এ কী কাণ্ড, অলক কি আজকের রাতটাও বাইরে কাটাবে? সত্যিই বর্ধমানে গেছে তো? আর কে কে আছে সেখানে? হঠাৎ ঝন ঝন করে বেজে ওঠে টেলিফোন। উঠে গিয়ে ধরলাম। হ্যাঁ, অলকই ফোন করছে। না, ট্রাঙ্ক লাইন নয়। অফিস থেকে।

—কে সুনন্দা? হ্যাঁ অলক বলছি। শোন, তুমি এখনই চলে এস এখানে। হ্যাঁ হ্যাঁ, অফিসে। জরুরী দরকার। আমি গাড়ি পাঠাচ্ছি।

অবাক হয়ে বলি—কী বলছ যা তা। আমি অফিসে যাব কি? তুমি বাড়ী আসবে না? কোথা থেকে বলছ তুমি?

—অফিস থেকেই বলছি। তোমার সঙ্গে জরুরী দরকার। গাড়ি যাচ্ছে। রামলালও যাচ্ছে। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস।

আমি আর কিছু বলার আগেই ও লাইন কেটে দেয়। এর মানে কি? অন্য কেউ এ-ভাবে ফোনে ডাকলে মনে হত কোন এ্যাক্সিডেণ্ট হয়েছে হয়তো। কিন্তু ওই তো কথা বলল। তা হলে ওর কিছু হয় নি। এমনভাবে আমাকে অফিসে ডেকে নিয়ে যাবার মানে? আমি কি কখনও ওর অফিসে গিয়েছি, যে এভাবে মাঝ রাতে আমাকে সেখানে ডেকে পাঠাচ্ছে?

গৌতমের ব্যাপারটা কি ও জানতে পেরেছে? কোন্ সূত্রে? নমিতা বা কুমুদবাবু কি বলেছেন? বেশ, তাই যদি হবে তাহলে সে ব্যাপারে ফয়শালা করবার রঙ্গমঞ্চ তার অফিস নয়। বাড়িতে এসে সে কৈফিয়ত দাবী করতে পারত।

ভাবতে ভাবতে গাড়ি এসে দাঁড়ায় পোর্টিকোর সামনে।

কাপড়টা পাল্টে নেমে আসি। রামলালকে জিজ্ঞাসা করি—কি হয়েছে রামলাল? সাহেব আমাকে ডাকছেন কেন?

রামলাল প্রত্যাশিত জবাবই দেয়। সে তা জানবে কেমন করে? ড্রাইভারকে প্রশ্ন করতে জানতে পারি, বর্ধমান থেকে গাড়ি ফিরেছে সন্ধ্যায়। তারপর থেকে কি যেন মিটিং হচ্ছে বন্ধ ঘরের ভিতর। কারখানার সামনে এসে পৌঁছাল গাড়ি। দারোয়ান আভূমি নত হয়ে প্রণাম জানায়। রাইফেলধারী প্রহরী পাহারা দিচ্ছে গেটে। কারখানার বাইরের দেওয়ালে ধর্মঘটী শ্রমিকদের হাতে লেখা পোস্টার। সাদা কাগজের উপর লাল কালি দিয়ে লেখা পোস্টারগুলো দেখে বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল যেন। একেই কি বলে 'দেওয়ালের লিখন'? মনে পড়ে গেল কলেজের দেওয়ালে একদিন ঐ কথাই নিজে হাতে লিখেছিলাম আমি পোস্টারে। গৌতমরা রাতারাতি সেগুলি এঁটে দিয়ে এসেছিল কলেজের প্রাচীরে। সেই ভুলে যাওয়া বেয়াল্লিশ সালে। ঐ 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে—।'

অলকের অফিস ঘরে ইতিপূর্বে কখনও আসি নি। মস্ত বড় ঘর, মাঝখানে সেগুনকাঠের বিরাট পালিশ করা টেবিল। কাগজ-চাপা থেকে প্রত্যেকটি জিনিস ঝক্‌ঝক্ করছে ফ্লুরেসেন্ট আলোয়। সবই উজ্জ্বল—শুধু মাঝখানে বসে আছে অলক—যেন বাজে পোড়া বটগাছ! সারাদিন বোধহয় স্নান হয় নি, রুক্ষ চুলগুলো উড়ছে ফ্যানের হাওয়ায়। টাইয়ের বাঁধনটা আলগা করা। এত হাওয়ার নিচেও লক্ষ্য করলাম ওর কপালে জমেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। অলক আজ দাড়ি কামায় নি! পাশ থেকে দুজন ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হাত তুলে নমস্কার করলেন আমাকে। ঠিক মনে নেই, বোধহয় প্রতিনমস্কার করতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি। অথবা হয়তো যন্ত্রচালিতের মতো হাত দুটো উঠে এসেছিল বুকের কাছে। ওঁরা ধীরে ধীরে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন। বিহ্বলভাবে দাঁড়িয়ে থাকি। পার্কার কলমটার উল্টো দিক দিয়ে অলক সম্মুখস্থ একটা চেয়ার নির্দেশ করে। আমি বসি।

মুহূর্তের নীরবতা ভেঙ্গে অলক বলে ওঠে—এ অসময়ে তোমাকে ডেকে আনার কারণটা জানতে নিশ্চয় খুব কৌতূহল হচ্ছে তোমার। অবাক হওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক, আমিও কম অবাক হই নি। তোমাকে আমি এখানে ডেকে আনি নি—এনেছেন এঁরা—

এতক্ষণে লক্ষ্য হয় ঘরে আরও দুজন লোক আছেন। একজন পুরুষ একজন মহিলা। ভদ্রলোক উঠে দাঁড়িয়ে বললে—বহুবচন নয়, মিস্টার মুখার্জি, একবচনে বলুন। আমি ওঁকে এখানে আনতে চাই নি। এনেছেন মিসেস ব্যানার্জি। আমি এর ভিতরে নেই। সুতরাং আপনার আপত্তি না থাকলে আমি বরং বাইরে অপেক্ষা করি।

আমি তাঁর দিকে ফিরতেই ভদ্রলোক আমাকে হাত তুলে নমস্কার করেন। অলকের অনুমতির অপেক্ষা না করেই তিনি বেরিয়ে যান ঘর ছেড়ে।

গৌতম!

ঘরে ক্ষণিক স্তব্ধতা। আমার মনটা ক্রমশ যেন অসাড় হয়ে

আসছে। গৌতম এখানে কেন? কি বলছিল সে অলককে এতক্ষণ? আমার কথা? বেশ তো, তাহলে স্থানত্যাগ করে পালিয়ে যাবার কি আছে? ও কি আমার কৈফিয়ত তলব করতে চায়? তাই যদি হবে তবে প্রধান সাক্ষীর তো বিচারালয়ে উপস্থিত থাকারই কথা। কিন্তু অলকের এ কি ব্যবহার! আমার বিরুদ্ধে তার যদি কোন অভিযোগই থাকে তাহলে তা নিয়ে আলোচনা করার এই কি পরিবেশ,না সময়?

অলক একটা সিগারেট ধরায়। কাঠিটা এ্যাশট্রেতে রাখে। সেটাতে বোধহয় জল ছিল না। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে কাঠিটা। আগুনটা বাইরে থেকে দেখা যাচ্ছে না। তবু এ্যাশট্রের অন্ধ কোটরে কাঠিটা যে নিজেরই বারুদের আগুনে দাউ দাউ করে জ্বলছে তা অনুভব করা যায়। দেশলাই কাঠিগুলো এত মূর্খ কেন? কেন বোবার মত মাথায় তুলে রেখেছে একফোঁটা বারুদ। আর যদি রেখেই থাকে তাহলে তা আবার ঘষে জ্বালতে যাওয়া কেন? এখন নিজেই পুড়ে মরছে!

কী আবোলতাবোল ভাবছি?

হঠাৎ অলক বলতে শুরু করে—আজ সকালে আমরা একটা উড়ো চিঠি পেয়েছি। আমি ছিলুম না এখানে। ফিরে এসে এইমাত্র সে চিঠি পড়েছি। তাতে শ্রমিকপক্ষ থেকে আমাকে শাসানো হয়েছে যে, তাদের দাবি যদি মেনে না নিই তাহলে আমাদের কয়েকটি গোপন তথ্য ফাঁস করে দেওয়া হবে। চিঠিটায় আমাদের কনফিডেন্সিয়াল ফাইলের লেটার নম্বর ও তারিখের উল্লেখ করা হয়েছে, আমাদের ইনকামট্যাক্স রিটার্নের গলতির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এই তথ্যগুলি প্রকাশ কোম্পানির পক্ষে মর্যাদাহানিকর এবং অত্যন্ত ক্ষতিকর। এ ক্ষেত্রে সন্দেহটা পড়ে আমার কন্‌ফিডেন্সিয়াল স্টেনো মিস্‌ রায়ের উপর, আই মিন মিসেস্‌ ব্যানার্জির উপর;—বাই-দ্য-ওয়ে, তোমাকে এঁর সঙ্গে এখনও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় নি। ইনি আমার স্টেনো মিসেস্‌ পর্ণা ব্যানার্জি!

এবারও নমস্কার করতে ভুলে গেলাম আমি। ও হাত দুটো বুকের কাছে এনে নমস্কারের ভঙ্গি করল—আমার মনে হল আসলে হাত দুটিতে যে বালা ও রিস্টওয়াচের বদলে শাঁখা ও নোয়া রয়েছে এইটেই সে হাতদুটি তুলে দেখাল। একতিলও বদলায় নি সে এ ছাড়া।

—যদিও মিস পর্ণা রায় নামে ইনি আমাদের অফিসে পরিচিত, কিন্তু আজ শ্রমিক নেতা শ্রীগৌতম ব্যানার্জি হঠাৎ দাবি করে বসেছেন এই শাঁখা-সিঁদুরহীন আমার স্টেনোটি তাঁর ধর্মপত্নী;—আই মীন অধর্মপত্নী, কারণ এঁদের মতে ধর্ম জিনিসটা সমাজের পক্ষে আফিঙের নেশার মতো পরিত্যজ্য। নাকি বলেন মিসেস্ ব্যানার্জি?

পর্ণা সে কথায় কান দেয় না। আমার দিকে ফিরে সবিনয়ে বলতে থাকে—'মাফ করবেন মিসেস্ মুখার্জি—রাত করে আপনাকে কষ্ট দিতে হল। অলকের ধারণা ও পক্ষকে আমিই গোপন সংবাদগুলি দিয়েছি। তাই আজ ও হঠাৎ আমার কৈফিয়ত তলব করে। আমি জানি, আমার উত্তরের মর্মোদ্ধার করতে পরবে না ও;—আমার ধারণা বারবারই আমাকে তুমি ভুল বুঝে এসেছ অলক…'

ওর দিকে ফিরে এই শেষ কথাটা বলেই আবার আমার দিকে ফেরে—'ও, আপনার স্বামীকে নাম ধরে ডাকছি বলে অবাক হচ্ছেন বুঝি…না, না, অধিকার-বহির্ভূত কিছু করছি না আমি। অলক আমাকে তুমি বলতে পারমিশান—আই শুড সে—বারে বারে সনির্বন্ধ অনুরোধ করেছে!'

আবার আমাকে ছেড়ে ওকে আক্রমণ করে—'নাকি মিসেস্ মুখার্জির সামনে আবার তোমাকে 'আপনি আজ্ঞে' করতে হবে? অফিসে সবার সামনে যেমন করি?'

অলক গর্জে ওঠে—কি সব আবোলতাবোল বকছেন আপনি!

—ও 'আপনি'! বুঝেছি, বুঝেছি, এইটুকু ইঙ্গিত বুঝবার মত বুদ্ধি আছে আমার! বেশ, আমিও না হয় আপনিই বলব সুনন্দা দেবীর সামনে! হ্যাঁ, যা বলছিলাম—বুঝলেন মিসেস মুখার্জি, ছাত্রীজীবন

থেকেই আমি স্বাধীনতা সংগ্রাম করে যাচ্ছি। সে যুগে ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন, এ যুগে অর্থনৈতিক। সে যুগে অনেকে এসে যোগ দিয়েছিল আমার সঙ্গে, তারা বেশ গরম গরম বক্তৃতা দিত। আজকাল তারা সুযোগ পেয়ে সরে দাঁড়িয়েছে—শুধু তাই নয়, 'অন্যায় যে সহে'র দল ত্যাগ করে 'অন্যায় যে করে'র দলে নাম লিখিয়েছে। তাতে অবশ্য আমার দুঃখ নেই। আমি একই পথে চলেছি। আপনার স্বামীর অধীনে চাকরি করার দীনতা আমাকে স্বীকার করতে হয়েছে পার্টির নির্দেশে। এ তথ্যগুলি ও পক্ষকে আমিই সরবরাহ করেছি ; কারণ....

অলক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে ওঠে—'ইউ ট্রেচারাস ওয়েঞ্চ!'

পর্ণা নির্বিকারভাবে বলে—শেক্সপীয়র!

এতক্ষণে বাক্যস্ফূর্তি হয় আমার, অবাক হয়ে বলি—মানে ?

পর্ণা আমার দিকে ফিরে হাস্য গোপন করে বলে—কি আশ্চর্য! আপনি এ খেলা জানেন না ? একে বলে 'কোটেশান-খেলা'। এই খেলার মাধ্যমেই আমরা হাতে হাত মিলিয়েছি যে! অলক একটা উদ্ধৃতি দেয়, আই মীন, অলকবাবু একটা উদ্ধৃতি দেন, আর সঙ্গে সঙ্গে আমাকে বলে দিতে হয় কোথা থেকে কোটেশান দেওয়া হল। ঠিক ঠিক বলতে পারলেই হাতে হাতে পুরস্কার পাই। অবশ্য কী জাতীয় পুরস্কার তা আর নাই বললাম, অলক লজ্জা পাবে তাহলে!

অলক ঘরময় পায়চারি করছিল। আমাদের কথোপকথন তার কানে যাচ্ছে বলে মনে হয় না। নিজের আসনে এসে বসে এতক্ষণে। অর্ধদগ্ধ সিগারেটটাকে অ্যাশট্রের গায়ে ঘষে ঘষে থেঁতলে দেয়। তারপর গম্ভীর হয়ে বলে—বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য আমরা আপনাকে মাসে মাসে মাইনে দিয়েছি ? এই কি আপনার ধারণা ?

—ঠিক তাই। ধারণা করা অন্যায় নয় নিশ্চয়ই। আমার আর কি কোয়ালিফিকেশন আছে বলুন ? স্টেনো হিসাবে আমার যোগ্যতা

যে কতখানি তা আর কেউ না জানুক আপনি-আমি তো জানি ? লোকে স্টেনো রাখে চারটি কারণে। হয়, সত্যি ডিক্‌টেশান নিতে—তা আমি পারি না। নয়, অফিসের শোভাবর্ধন করতে,—আমার ক্ষেত্রে সেটাও ঠিক নয়, কারণ আমার ফটো দেখেই পছন্দ করেছেন আপনি। এতদিনে তোমার মনের ভাব অবশ্য অন্য রকম হয়েছে, কিন্তু ফটো দেখেই নিশ্চয় গলে যাও নি তুমি। তৃতীয়ত স্ত্রীর উপরোধ। কিন্তু মিসেস্ মুখার্জি আমাকে চেনেন না যে, সুপারিশ করবেন। আর স্টেনো রাখার চতুর্থ কারণ হতে পারে তাকে দিয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করানো। যেহেতু প্রথম তিনটি কারণ আমার ক্ষেত্রে অচল, তাই আমার ধারণা হয়েছিল বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্যই আমাকে মাসে মাসে মাইনে দেওয়া হয়।

হঠাৎ খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—আচ্ছা, বুকে হাত দিয়ে বল তো অলক, আমার মাইনে বাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলে কেন ? সে কি আমাকে ভালবেসে ফেলেছ বলেই, নাকি বিশ্বাসঘাতকতা করার জন্যে ?

অলক চিৎকার করে ওঠে—শাট আপ ! ইউ ইনফার্নাল ভাইপার !

একগাল হেসে পর্ণা বলে—প্যারাডাইস লস্ট ! মিল্টন !

থরথর করে কাঁপতে থাকে অলক, ভূকম্পনে উদ্‌গীরণ-উন্মুখ আগ্নেয়গিরির মতো।

পর্ণা একটু অপেক্ষা করে আবার গম্ভীরভাবে বলতে থাকে—অলক, তোমার হাতে আছে অগাধ অর্থ, শ্রমিক-মালিকের যুদ্ধে তুমি অন্যায়ভাবে প্রয়োগ করছ তোমার ক্ষমতা। ফ্যাক্টরীতে লক-আউট ঘোষণা করে, ছাঁটাই করে, ধর্মঘটী কর্মীদের পাওনা না দিয়ে তুমি আর্থিক পীড়ন করে চলেছ—অন্যায়-যুদ্ধ চালাচ্ছ তোমার তরফ থেকে। সুতরাং এ-পক্ষ অন্যায়-যুদ্ধ করলে রাগ করছ কেন ? আর তাছাড়া জানো তো, জীবনের দুটি ক্ষেত্রে অন্যায় বলে কোন শব্দের স্বীকৃতি নেই ! এ বিষয়ে আমি চমৎকার একটা কোটেশান শুনেছিলাম

ছাত্রীজীবনে। সেটা আজও ভুলি নি আমি—'দেয়ার্স নাথিং আনফেয়ার ইন ল্যভ অ্যাণ্ড ওয়ার!' বলতে পার কার কোটেশান?

অলক জবাব দেয় না।

পর্ণা আমার দিকে ফিরে বলে—আপনি জানেন?

জবাব দেবার ক্ষমতা তখন আমারও ছিল না।

—এটা 'ল্যভ' না 'ওয়ার' ঠিক জানি না, সম্ভবত দুটোই। সুতরাং এখানে অন্যায়-যুদ্ধ করায় আমার বিবেকে কোন দাগ পড়ে নি।

আবার সংযম হারায় অলক, বলে—বিবেক! তোমার মতো রাস্তায়-পাওয়া নষ্ট মেয়ের বিবেক বলে আবার কিছু থাকে নাকি?

পর্ণা চমকে ওঠে! ঠিক এ ভাষায় গালাগালি শুনবার জন্য বোধ-করি প্রস্তুত ছিল না সে। চাবুক সেই চালাচ্ছিল এতক্ষণ, ডাইনে-বাঁয়ে—কিন্তু শালীনতার সীমা অতিক্রম না করে, রুচির মাত্রা না ছাড়িয়ে। পর্ণার শ্বাপদ চক্ষু দুটি জ্বলে ওঠে।

অলক উত্তেজিতভাবে বলে—যাক, অনেক অর্থ তুমি নিয়েছ কোম্পানির, এখন বল, কত টাকা পেলে এই যুদ্ধ থেকে তুমি সরে দাঁড়াতে পার?

আমি তখন সম্পূর্ণ অসাড় হয়ে গেছি। নীচে, কত নীচে নেমে গেছে ঐ মেয়েটা! একদিন একই ক্লাসে পড়তাম আমরা, বসতাম একই বেঞ্চিতে। আমার অন্তরাত্মা বলে উঠল—বল পর্ণা, এখন অন্তত একবার বল—টাকা দিয়ে আদর্শকে কেনা যায় না!

হায়রে আমার দুরাশা! অম্লানবদনে পর্ণা বলল—পাঁচ হাজার টাকা।

পকেট থেকে চেকবই বার করে অলক।

—মাফ করবেন মুখার্জি সাহেব। চেক নেব না, অনার না হতে পারে, ক্যাশ টাকা চাই!

এতক্ষণে আত্মসংবরণ করেছি আমি! প্রাণপণ শক্তিতে নিজেকে সংযত করে বলি—টাকা পেলে আপনারা বুঝি সব পারেন?

পর্ণা হেসে বলল—আপনি বুঝি বায়রণ পড়েন নি? অলকের একটা ফেভারিট কোটেশান শোনেন নি? 'রেডি মানি অ্যালাদীনস্ ল্যাম্প?'

ততক্ষণে আয়রণ চেস্ট খুলে পাঁচ তাড়া নোট বার করে এনেছে অলক। পাঁচ বাণ্ডিল নোট টেবিলের উপর রেখে বলে—এ-গুলো নেবার পরেও যে তুমি ব্ল্যাকমেলিং করবে না তার প্রমাণ কি?

—তাই কি পারি?

—পার, সব পার তুমি! তোমার মত চরিত্রহীন নষ্ট মেয়েমানুষ না পারে কি?

আমার ভীষণ কান্না পায়। ছি ছি ছি। মাত্র পাঁচটা হাজার টাকার শোকে অলক এমন অভিভূত হয়ে পড়ল? শালীনতাবোধ বলে কি কিছুই অবশিষ্ট নেই তার? কিন্তু এ টাকার শোকে নয়—অপমানের জ্বালায়। স্ত্রীর সামনে তার চরিত্রের প্রতি ইঙ্গিত করায় ভদ্রতাবোধ হারিয়ে ফেলেছে অলক!

পর্ণার চোখদুটি জ্বলে ওঠে। শ্বাপদ চক্ষু! কয়েক মিনিট চুপ করে কি ভাবে, বোধহয় সামলে নেয় নিজেকে। তারপর অদ্ভুতভাবে হাসে ও। বলে, একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না অলক?

ও গর্জে ওঠে—বাড়াবাড়ি! তোমার মত বিশ্বাসঘাতক নষ্ট চরিত্রের মেয়ে।

হাত তুলে তাকে থামিয়ে দেয় পর্ণা। বলে—'বিশ্বাসঘাতকতা' তুমি কাকে বল অলক? বিশ্বাসঘাতক কে নয়? আমার সঙ্গে রাত বারোটায় 'ফল অফ বার্লিন' দেখে এসে যখন স্ত্রীর কাছে পোলিশ বন্ধুর গল্প বলেছিলে তখনও ও শব্দটার মানে তুমি জানতে? শুধু তাই নয়—আবার হেসে হেসে সে গল্প যখন আমার কাছে ফলাও করে বলেছিলে তখনও কি মনে ছিল, আমি রাস্তায় পাওয়া নষ্ট মেয়েমানুষ?

অলক জবাব দিতে পারে না। বাকরোধ হয়ে গেছে যেন তার। পর্ণা হেসে বলে—ভয় নেই; ব্ল্যাকমেলিং আমি করতে পারব না।

জানি, এসব প্রশ্নের উত্তর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না!

তা না যাক, তবু বলব আমার অঙ্কে শুধুই লোকসান জমা পড়ে নি। এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল—ওর, আমার, আমাদের দুজনেরই। বৈচিত্র্য চেয়েছিলাম না আমি? তা সে বৈচিত্র্যও এসেছিল আমাদের দাম্পত্য জীবনে, চরম সর্বনাশীর বেশে। তাতে আমরা দুজনেই বুঝতে শিখেছি আমাদের দুর্বলতা কোথায়। বড় বেশী জাঁক হয়েছিল আমাদের। ঠিক কথা, এ আঘাতের প্রয়োজন ছিল।

উঠে এলাম অলকের কাছে। ওর হাতটা তুলে নিয়ে বলি—চল, বাড়ি চল।

ও কি যেন ভাবছিল। চমকে উঠে বলে—এ্যাঁ?

বলি—এতটা বিচলিত হচ্ছ কেন? আমি ওর একটা কথাও বিশ্বাস করি নি। ভেঙে পড়লে তো চলবে না। ওঠ চল।

—কোথায়?

—কোথায় আবার কি? বাড়িতে। তোমার 'অলকনন্দায়'।

অলক আমার মাথাটা টেনে নিয়ে বলে—তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ?

আমি হেসে বলি, অলক, বল দেখি—কে বলেছেন—দে হু ফরগিভ্ মোস্ট শ্যাল বি মোস্ট ফরগিভন্?

আমার হাত দুটি ধরে অলকও হেসে ফেলে।

বলে—বেইলি।

শেষ

'অলকনন্দা'-র অগ্রজ :

বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প ১৯৫৫
বল্মীক ১৯৫৮
ব্রাত্য ১৯৫৯
বাস্তুবিজ্ঞান ১৯৫৯

মনামী ১৯৬০
নৈমিষারণ্য ১৯৬১
দণ্ডকশবরী ১৯৬২
অন্তর্লীনা ১৯৬২